প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা

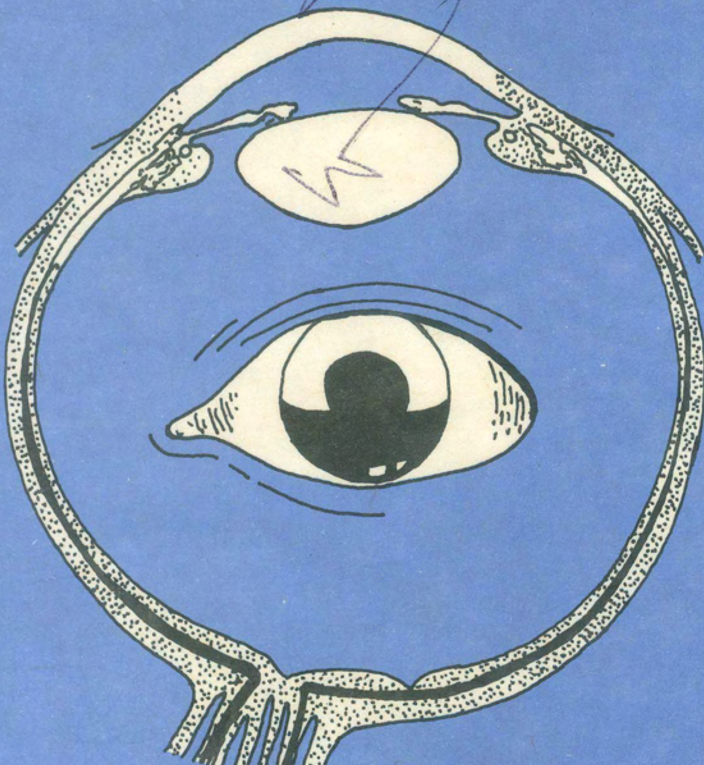

এইচ এম এ আর মামুনূর রশীদ

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা

ডা. এইচ এম এ আর মামুনুর রশিদ

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা

(চক্ষু চিকিৎসাবিদ্যা : প্রাথমিক পরিচর্যা)

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/মে ১৯৯৭

বাএ (৯৬–৯৭ পাঠ্যপুস্তক : জী কৃ চি : ৫) ৩৫৩১

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জী কৃ চি ২২৯

প্রকাশক
আনিসুর রহমান
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ইকবাল আহমেদ তপু

মূল্য
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

PRATHAMIC CHAKKHU PARICHARJA (Primary Eye Care) by Dr. H.M.A.R. Mamunur Rashid. Published by Anisur Rahman, Director (in-charge), Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First edition : May 1997.
Price : Taka 50·00 only.

ISBN 984-07-3540-3

BAN... Library
Accession No. 17254
Date 10.6.04

উৎসর্গ

বাংলাদেশের অন্ধজনের
করকমলে

ভূমিকা

চোখ মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ অঙ্গটি ছোট এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সামান্য কিছুতেই অন্ধ হয়ে যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্গটির স্পর্শকাতরতা লক্ষ্য করে আমার ইচ্ছা জাগে সহজ করে বাংলা ভাষায় *প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা* বিষয়ক বই লেখার–যাতে সহজেই চিকিৎসা পেশাজীবী ছাড়াও অন্যান্যরা উপকৃত হতে পারবেন। এতে তাঁরা রোগীকে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণের জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারবেন।

চক্ষু চিকিৎসাবিজ্ঞান বেশ ব্যাপক, বিস্তৃত ও কঠিন বিষয়। *প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা* বইটি চক্ষু চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বই নয়। তবে প্রাথমিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সংগৃহীত আধুনিক তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

এ বই লিখতে গিয়ে আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সাহায্য নিয়েছি। সবার সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে পারিনি। আমি তাঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ ছালাম ও ধন্যবাদ জানাই।

বইটি প্রণয়নে দেশী ও বিদেশী বইপত্রের সাহায্য নিতে হয়েছে। সেজন্য সেসব গ্রন্থাকার ও প্রকাশকের কাছেও আমি ঋণী। বইটি প্রকাশনায় বাংলা একাডেমীর জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আমাকে সব রকম সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এজন্য তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বইটি মূলত চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। তবে চক্ষু চিকিৎসার সাথে জড়িত চিকিৎসক ও মাঠকর্মীদেরও উপকারে আসবে আশা করি। বইটি পাঠে উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বইটি আমার প্রথম প্রকাশনা হিসেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে—এ সম্পর্কিত গঠনমূলক সমালোচনা স্বাদরে গৃহীত হবে।

সর্বোপরি বাংলা একাডেমী বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি খুবই গর্বিত ও আনন্দিত।

এইচ এম এ আর মামুনুর রশিদ

কালাই থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প
জয়পুরহাট

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : চোখের গঠন ও কাজ ১১–২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা ২৫–৪৯
প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার গুরুত্ব ২৫ ; আঘাতজনিত চক্ষু অন্ধত্বের উপাদান ২৫ ; চোখে আঘাত ২৬ ; চোখের সংক্রামক রোগের প্রাথমিক পরিচর্যা ৩৫ ; প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার সেবার পদ্ধতি ৩৯ ; চোখের প্রাথমিক পরীক্ষা ৪৪ ; ভ্রাম্যমাণ চক্ষু সেবাদলের মাধ্যমে প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা ৪৮ ;

তৃতীয় অধ্যায় : অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের কারণ ও চিকিৎসা ৫০–৬৮
পরিবেশগত ৫০ ; অর্থনৈতিক ৫০ ; শারীরিক ৫১ ; সামাজিক কৃষ্টিগত অভ্যাস ৫২ ; বাংলাদেশে শিশুদের অন্ধত্বের অবস্থা ৫৪ ; অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ ৫৭ ; সমন্বিত শিশু পরিচর্যা কার্যক্রম ৬১ ; অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বে বাংলাদেশের কার্যক্রমের ইতিহাস ও সে সম্পর্কিত সুপারিশমালা ৬২; অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য অন্ধত্ব ও সমাধান ৬৫;

চতুর্থ অধ্যায় : হঠাৎ আক্রান্ত চক্ষু রোগ ও চিকিৎসা ৬৯–৮৭

পঞ্চম অধ্যায় : ধীরে ধীরে আক্রান্ত চোখের অন্ধত্বের কারণ ও চিকিৎসা ৮৮–৯৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : লাল চোখ ১০০–১১৩

সপ্তম অধ্যায় : চোখের প্রেসার ও তার প্রতিকার ১১৪–১১৮

অষ্টম অধ্যায় : দ্রুত চিকিৎসার আওতাভুক্ত চোখের রোগ ১১৯–১২২

নবম অধ্যায় : টেরা চোখ ১২৩–১২৭

দশম অধ্যায় : চোখে ব্যবহৃত ওষুধ : পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ব্যবহার ১২৮–১৩২

একাদশ অধ্যায় : চক্ষু রোগে চশমার গুরুত্ব ১৩৩–১৩৬

গ্রন্থপঞ্জি ১৩৭

পরিভাষা ১৩৮

BANSDOC Library
Accession No. 17754
Date 10.6.04

প্রথম অধ্যায়
চোখের গঠন ও কাজ

মানুষের জন্য চোখ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আকারে ছোট হলেও এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান অঙ্গ, যার মাধ্যমে আমরা স্রষ্টার সৃষ্টিসমূহ দেখতে পাই। এটি একটি সংবেদনশীল অঙ্গ যা আলো তরঙ্গকে স্নায়ুতরঙ্গে রূপান্তরিত করে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, যার ফলে আমরা দেখি। মস্তিষ্কে অক্সিপিটাল লোবে অবস্থিত ভিস্যুয়াল করটেক্স (visual cortex)-এ স্নায়ুতরঙ্গ দেখার প্রতিবিম্ব তৈরি করে। চোখকে বাইরের আঘাত হতে রক্ষার জন্য অক্ষিপল্লব, অশ্রুসংবহনতন্ত্র, অক্ষিকোটর এবং অক্ষিকোটরের মাঝে অবস্থিত ধারণকৃত অক্ষিকোটরের চর্বি রয়েছে। চোখের কার্যকর ক্ষমতা সক্রিয় রাখার জন্য অক্ষিস্নায়ু, চোখের বাইরে চোখ নড়াচড়ার জন্য মাংসপেশীসমূহ, মস্তিষ্কের স্নায়ুসমূহ, এবং চোখের ধমনী ও শিরাসমূহ রয়েছে। চোখের বিভিন্ন অংশ চিত্র ১–এ উপস্থাপন করা হয়েছে। চোখ মূলত তিনটি আবরণ দিয়ে গঠিত। সেগুলো হচ্ছে–

১. বাইরের তন্তুময় আবরণ (Fibrous coat) : সামনে নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়া, পিছনে স্ক্লেরা।
২. মাঝের রক্তনালীময় আবরণ (Vascular coat) : সামনে কণীনিকা বা আইরিশ, মাঝে সিলিয়ারি বডি, পিছনে অক্ষিকৃষ্ণ।
৩. ভিতরের স্নায়ুর আবরণ (Narvous coat) : অক্ষিপট বা রেটিনা।

অক্ষিকোটর (Orbit)
কপালের নিচে নাকের দু'পাশে দুটি গর্ত রয়েছে। এটিই অক্ষিকোটর (চিত্র ২)। এর মধ্যেই অক্ষিগোলক বা চোখ থাকে। অক্ষিকোটর অক্ষিগোলককে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। সাতটি হাড় দিয়ে অক্ষিকোটর গঠিত। এক জোড়া ফ্রন্টাল হাড় অক্ষিকোটরের ছাদ তৈরি করে। পাশের দেওয়াল — পিছন দিকে স্পেনোয়েড হাড়ের বড়পাখা দিয়ে তৈরি এবং সামনে একজোড়া জাইগোমেটিক হাড় দিয়ে তৈরি।

কাগজের মতো পাতলা ম্যাক্সিলারি হাড় এবং সামনের দিকে নিচের অক্ষিকোটরের প্রান্ত নিয়ে অক্ষিকোটরের মেঝে গঠিত। ক্ষুদ্র জোড়া প্যালাটাইন হাড় দিয়ে অক্ষিকোটরের মেঝের পিছন দিক গঠিত।

অক্ষিকোটরের অন্তঃপার্শ্বীয় দেওয়াল (medial wall) ম্যাক্সিলারি হাড়ের ফ্রন্টাল প্রসেস, ল্যাক্রিমাল ও ইথময়েড হাড় দিয়ে গঠিত। এটির মধ্য দিয়ে অনেক ছিদ্রপথ আছে, এর মধ্যে অপটিক ছিদ্রপথ (optic foramen) উল্লেখযোগ্য, যা দিয়ে অপটিক স্নায়ু, অপথ্যালমিক শিরা বের হয় এবং ধমনী প্রবেশ করে।

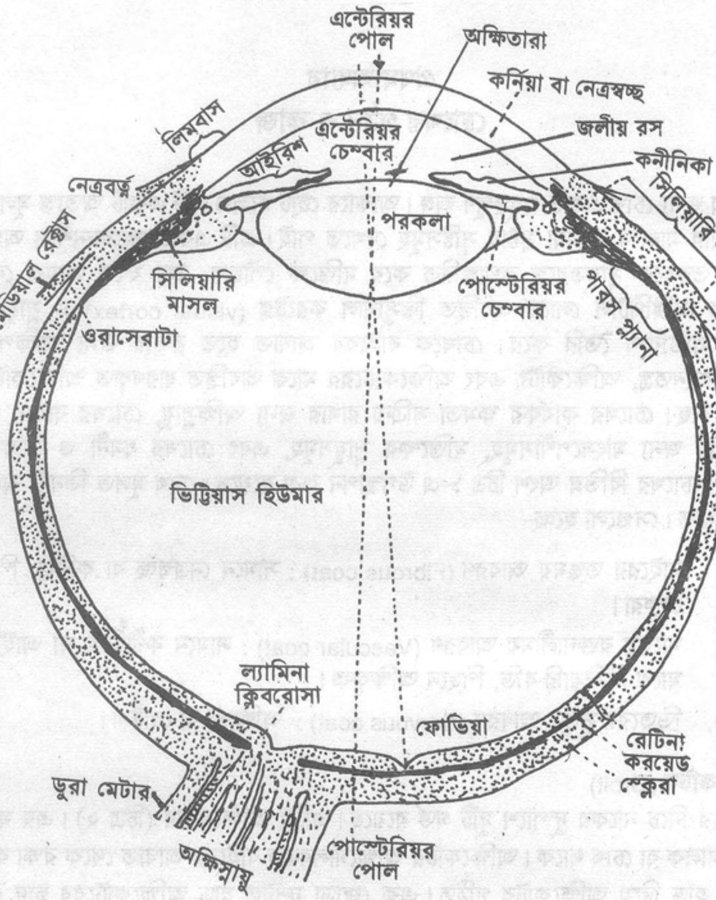

চিত্র ১ : চোখের পার্শ্বচ্ছেদ

সুপিরিয়র অরবিটাল ফিসারের (superior orbital fissure) ভিতর দিয়ে রক্তবাহীনালী, চোখের মাংসপেশীর চালক স্নায়ু যায় এবং ইনফিরিয়র বা নিচের অরবিটাল ফিসারের (infeior orbital fissure) ভিতর দিয়ে নিচের অরবিটাল শিরা বের হয় এবং ধমনী ও স্নায়ু ঢোকে। অক্ষিকোটর পেরিয়রবিটা দিয়ে আবৃত। দুটি ফ্রন্টাল, দুটি ইথমোয়ডাল, দুটি ম্যাক্সিলারি, দুটি স্ফেনোইডাল সাইনাস অক্ষিকোটরের চারপাশে রয়েছে।

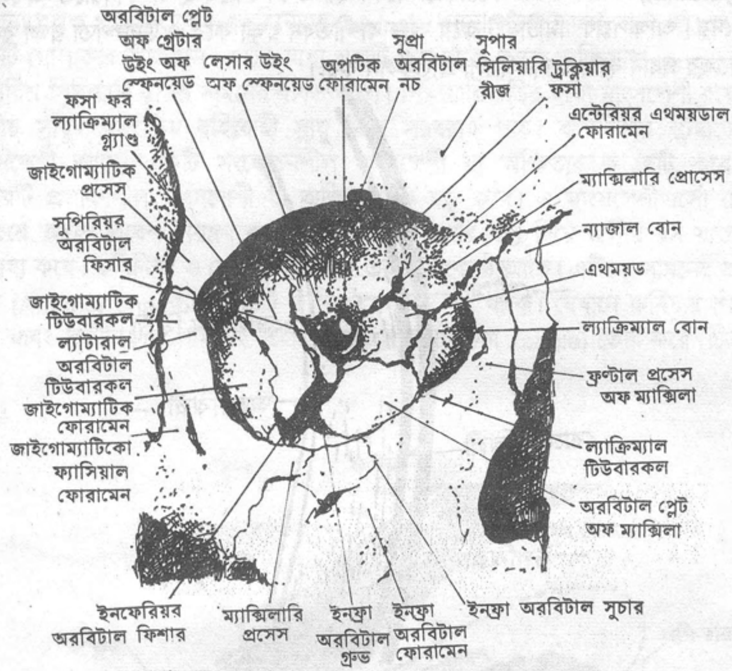

চিত্র ২ : অক্ষিকোটর

১. বাইরের তন্তুময় আবরণ

নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়া এবং শ্বেতপটল বা স্ক্লেরা নিয়ে চোখের বাইরের তন্তুময় আবরণ গঠিত।

নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়া (Cornea) : অক্ষিগোলকের সামনের ০.২ অংশ স্বচ্ছ ও রক্তনালীবিহীন। এ অংশকে নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়া বলে। এর ব্যাস প্রায় ১১.৫ মি. মি.। এর পাঁচটি স্তর আছে। এটির উপঝিল্লি ৫–৬ স্তরের কোষ দিয়ে গঠিত বোমেন ঝিল্লি, স্ট্রোমা ও ডেসিমেন ঝিল্লি এবং এককোষবিশিষ্ট অন্তঃঝিল্লি নিয়ে গঠিত (চিত্র ৩)। রক্তনালীবিহীন কর্নিয়া লিম্বাসের রক্তনালীর জালিকা বাতাসের অক্সিজেন ও জলীয় রস হতে খাবার পায়। কর্নিয়াতে সংজ্ঞাবহ স্নায়ু আছে যা ট্রাইজিমিনাল স্নায়ুর প্রথম শাখা দিয়ে সরবরাহ পায়। আর এজন্যই কর্নিয়াতে সামান্যতম 'ঘা' দেখা দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। যখন উপঝিল্লি ও

অন্তঃঝিল্লি সুস্থ থাকে তখন সোডিয়াম ও পটাশিয়াম পাম্প দিয়ে এটির উদাল্পতা রক্ষা (dehydration) করে। যখন অন্তঃঝিল্লি ধ্বংস হয় তখন নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়াতে অস্বচ্ছতা দেখা দেয়। অক্ষিপল্লব মিটিমিটি করে অশ্রু বাষ্পীভবন রক্ষা করে ও উদাল্পতা রক্ষা করে। নেত্রস্বচ্ছের প্রধান কাজ হলো আলো প্রতিফলন করা।

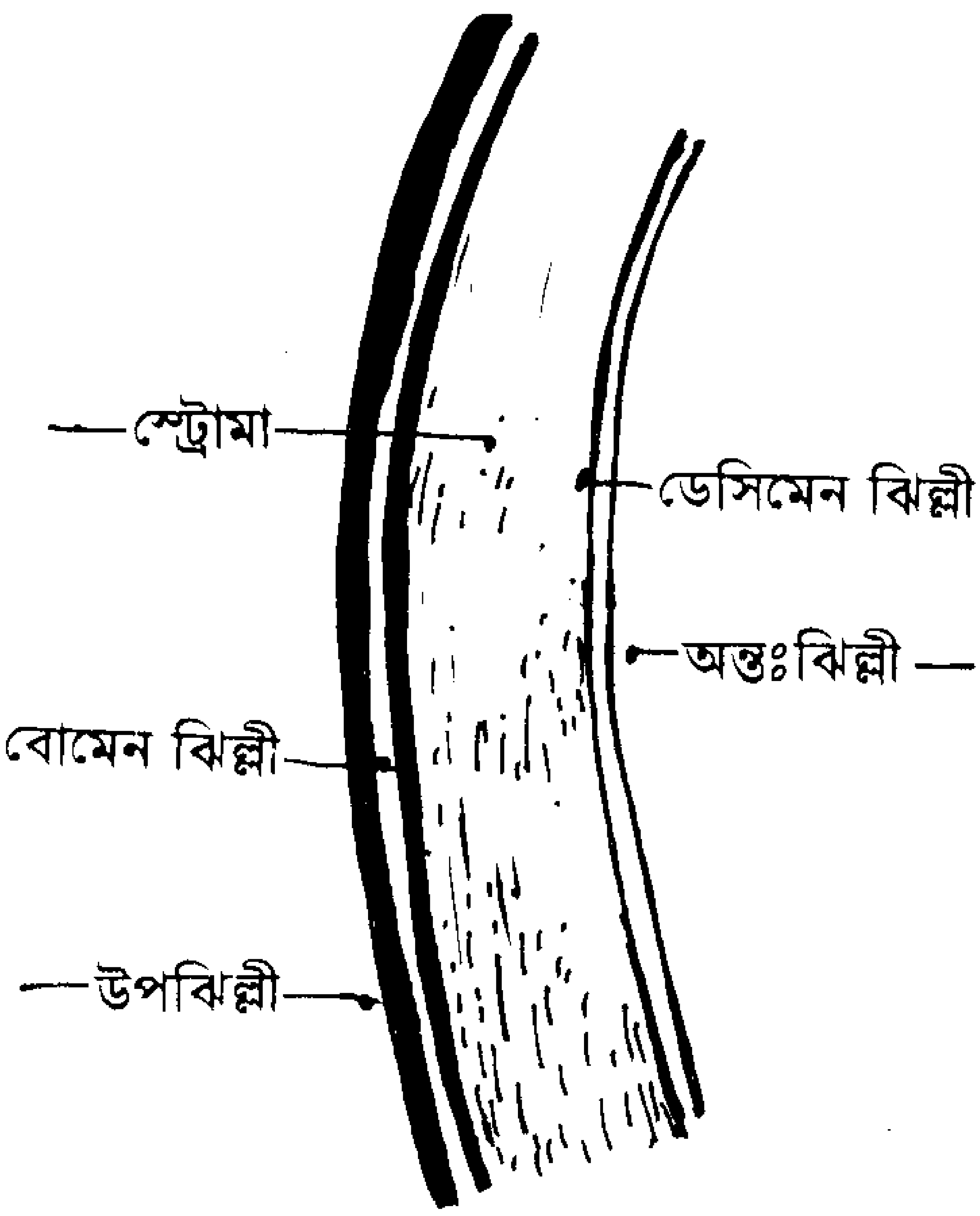

চিত্র ৩ : নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়ার গঠন

শ্বেতপটল বা স্ক্লেরা (Sclera) : অক্ষিগোলকের ৪ থেকে ৫ ভাগ সাদা, এটিই শ্বেতপটল যা তন্তুময় কোষ দিয়ে তৈরি। এটি পিছন দিকে অপটিক স্নায়ুর বহিঃআবরণের সাথে মিশে গেছে। এটি সামনের দিকে লিম্বাসে শেষ হয়েছে। কর্নিয়া বা স্ক্লেরার সংযোগস্থলকে লিম্বাস (limbus) বলে। শ্বেতপটলের পিছনদিকে জালিকাসদৃশ স্থান ল্যামিনা ক্রিবোসা (lamina cribosa) যা দিয়ে অপটিক স্নায়ুতন্তু বের হয়। শ্বেতপটলের বাইরে অক্ষিগোলকের নেত্রবর্ত্ম (conjunctiva) দিয়ে ঢাকা থাকে। শ্বেতপটলের যেস্থানে রেকটাস মাংসপেশী লাগানো সেস্থানে ৪টি সিলিয়ারি ধমনী ঢোকে এবং শিরা বের হয়ে আসে। অপটিক স্নায়ু শ্বেতপটলের যে স্থান দিয়ে বের হয়ে আসে সে স্থানের চারপাশ দিয়ে লম্বা ও ছোট পোসটেরিয়র সিলিয়ারি রক্তনালীসমূহ ঢোকে।

২. **মাঝের রক্তনালীর আবরণ** (Vascular coat)

ইউভিয়াল ট্রাক্ট : এটি অক্ষিগোলকের মধ্যবর্তী স্তর। এটির সামনে কণীনিকা বা আইরিশটি, মাঝে সিলিয়ারি বডি (ciliary body) ও পিছনে অক্ষিকৃষ্ণ (choroid) (চিত্র ১)। এ স্তর রক্তনালীসমৃদ্ধ ও রঞ্জক পদার্থের তৈরি। কালো কণীনিকা স্বচ্ছ কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে

পরিষ্কারভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এটির পিছনের দুটি স্তর রঞ্জক পদার্থের তৈরি বলে কালো দেখা যায়। রঞ্জক পদার্থের তারতম্যের কারণে রঙের পরিবর্তন ঘটে যেমন নীল কণীনিকায় সামান্য রঞ্জক পদার্থ থাকে। এলবিনোতে (albino) কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না। আইরিশ একটি গোলাকার আচ্ছাদন। এটির মধ্যে একটি ছিদ্র থাকে তাকে অক্ষিতারা (pupil) বলে। আইরিশ সিলিয়ারি বডির সামনের বর্ধিত অংশ। সিলিয়ারি বডির মধ্যে মাংসপেশী রয়েছে যা তৃতীয় স্নায়ুর স্বয়ংক্রিয় বহিঃবাহী স্নায়ু দিয়ে সরবরাহ পায়। কণীনিকার স্ট্রমাতে দুটি মাংসপেশী আছে—একটি সংকোচনশীল মাংসপেশী যা অক্ষিতারাকে ছোট করে এবং অপরটি প্রসারণশীল মাংসপেশী যা অক্ষিতারাকে বড় করে। এ মাংসপেশীগুলো চোখের ভিতরে আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং চোখের তারার মধ্য দিয়ে জলীয় রস যাতায়াতে সাহায্য করে। কণীনিকা ও নেত্রস্বচ্ছের মাঝে একটি প্রকোষ্ঠ আছে। এটিকে সামনের প্রকোষ্ঠ বলে (Anterior chamber)। এটি জলীয় রস দিয়ে পূর্ণ থাকে। যেখানে কর্নিয়ার পিছনের তল এবং কণীনিকার সামনের তল মিলে সেখানে কোণ (angle) তৈরি করে (চিত্র ৪)।

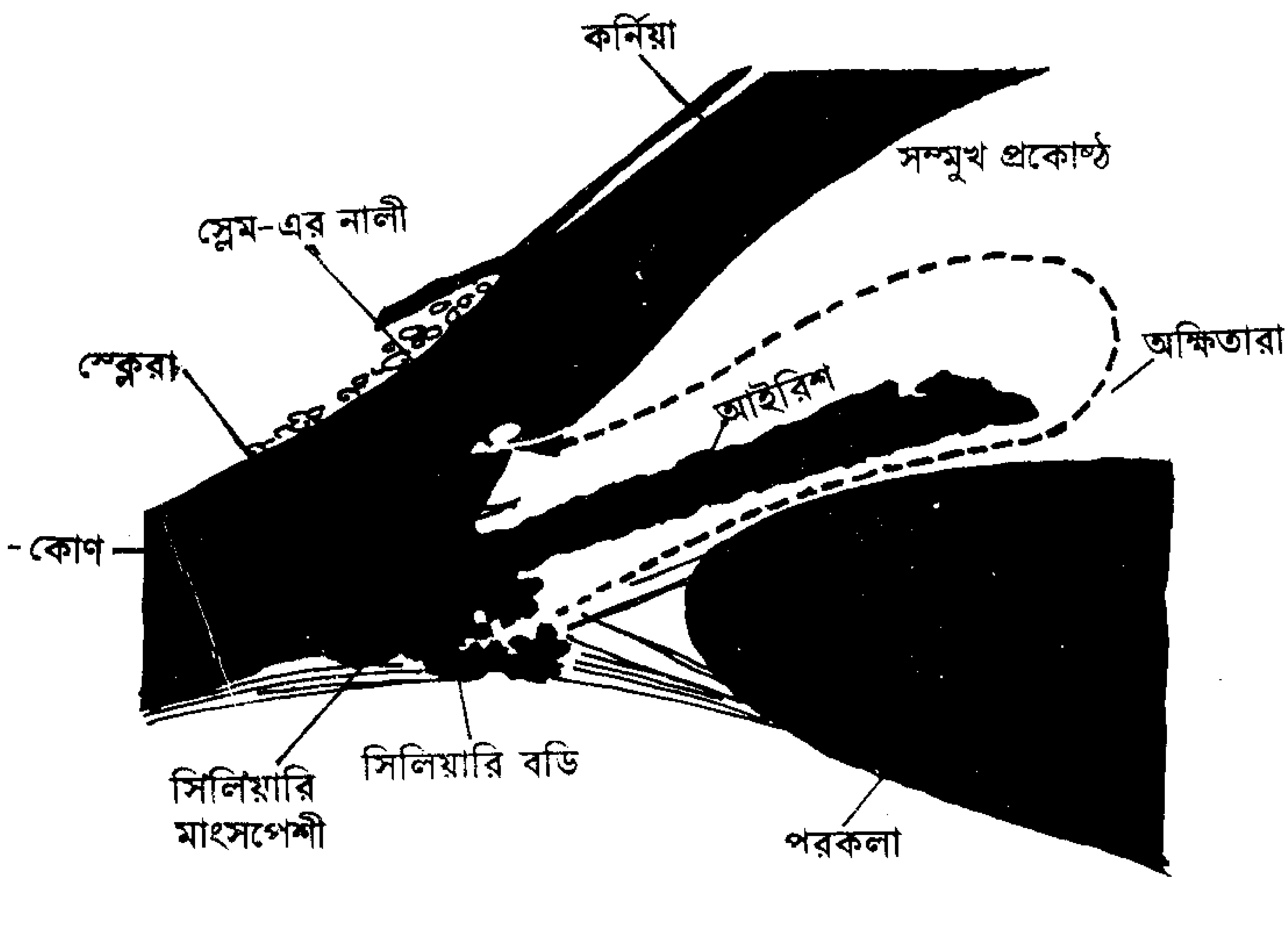

চিত্র ৪ : জলীয় রসের প্রবাহ (তীর চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে)

এক্ষেত্রে ট্রাবিকুলার মেস্‌ওয়ার্ক নামে আণুবীক্ষণিক ছিদ্রপথ আছে। এটির মাধ্যমে জলীয় রস শ্লেমস্ নালীতে প্রবেশ করে। আইরিশের পাদমূল থেকে গোলাকার সিলিয়ারি বডি বর্ধিত হয়ে খাঁজকাটা এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে একে ওরাসেরাটা (oraserrata) বলে। এ ওরাসেরেটায়

অক্ষিকৃষ্ণ ও অক্ষিপুটের শেষপ্রান্ত অবস্থিত। সিলিয়ারি বডির উপঝিল্লি রঞ্জক পদার্থের তৈরি কিন্তু সিলিয়ারি প্রসেস তেমন নয়। এটি পাহাড় ও উপত্যকার মতো দেখতে হয়। দুটি সুস্পষ্ট এলাকা নির্ণয় করা যায়। সামনে ২ মি. মি. অংশ মসৃণ, তাকে পার্স প্লেনা (pars plana) বলে। পার্সপ্লেনা পাতলা সিলিয়ারি মাংসপেশী দিয়ে তৈরি যা সিলিয়ারি উপঝিল্লি দিয়ে আবৃত। রঞ্জক ও অরঞ্জক সিলিয়ারি উপঝিল্লিগুলো কণীনীকার পিছনতলে রঞ্জক স্তরে পৌছে। সিলিয়ারি মাংসপেশীগুলো লম্বালম্বি, তির্যক ও গোলাকার। এটির কাজ হলো জনুলার তন্তুকে সংকোচন ও শ্লথ করা। এটি লেন্স (lens) ক্যাপসুলের চাপকে পরিবর্তন করে লেন্সকে বেশি উত্তল করে, ফলে কাছের জিনিস ভালো দেখা যায়। এ প্রক্রিয়াকে উপযোজন (accommodation) বলে। জনুলার তন্তু সিলিয়ারি প্রসেসের খাঁজ হতে উৎপন্ন হয়। যা পরকলাকে ঠিকভাবে ধরে রাখে। আইরিশ ও সিলিয়ারি বডি আইরিশের বড় জালিকাময় রক্তনালী (circulus arteriosus iridis) হতে সরবরাহ পায়।

সিলিয়ারি প্রসেস থেকে জলীয় রস (acquous humour) তৈরি হয়। এটি প্রথমে পিছনের প্রকোষ্ঠে পড়ে তারপর অক্ষিতারার মধ্য দিয়ে সামনের প্রকোষ্ঠে পৌছে। ট্রাবিকুলার মেসওয়ার্ক দিয়ে শ্লেমস ক্যানালের ভিতর দিয়ে বের হয়ে সংবহনতন্ত্রে (circulation) মিশে (চিত্র ৪)।

অক্ষিকৃষ্ণ (Choroid)

অক্ষিকৃষ্ণ অপটিক স্নায়ু হতে শুরু করে ওরাসেরেটা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি ইউভিয়াল ট্রাক্টের পিছনের বড় অংশ মূলত রক্তবাহী নালিকা দিয়ে তিনটি বিশেষ স্তরে গঠিত। বড় রক্তনালী স্তরে শিরা যারা পরস্পর মিলে ৪টি ভরটেক্স শিরা গঠন করে এবং অক্ষিগোলক হতে বের হয়ে যায়। সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও ভিতরের রক্তনালীর স্তরকে কোরিওক্যাপিলারি বলে যা রেটিনার বাইরের আবরণকে রক্ত সরবরাহ করে। অক্ষিকৃষ্ণের রক্তনালীর বাইরে সুপ্রাকরয়েড ও ভিতরে ব্রুকের আবরণী দিয়ে আবৃত।

৩. ভিতরের স্নায়ুর আবরণ ((Nervous coat)

রেটিনা : রেটিনা অপটিক স্নায়ু হতে শুরু করে ওরাসেরেটায় শেষ হয়। এটির দশটি স্তর আছে (চিত্র ৫)। এটি করয়েডের সাথে শক্তভাবে লাগানো থাকে। বাইরে থেকে ভিতরে রেটিনার ১০টি স্তর থাকে যা উল্লেখ করা হলো—

(১) রেটিনার উপঝিল্লির রঞ্জক স্তর (Pigmented epithelial layer)

(২) রড ও কোনের স্তর (Layers of rods cons)

(৩) বাইরের লিমিটিং ঝিল্লি (External Limiting membrane)

(৪) বাইরের নিউক্লিয়ার স্তর (External nuclear layer)

(৫) বাইরের জালিকাকৃত স্তর (External plexiform layer)
(৬) ভিতরের নিউক্লিয়ার স্তর (Inner Nuclear layer)
(৭) ভিতরের জালিকাকৃত স্তর (Inner plexifom Layer)
(৮) স্নায়ুর গ্রন্থির স্তর (Gaglionic cell layer)
(৯) স্নায়ুর স্তর (Nerve fibre layer)
(১০) ভিতরের লিমিটিং ঝিল্লিস্তর (Internal limiting membrane)

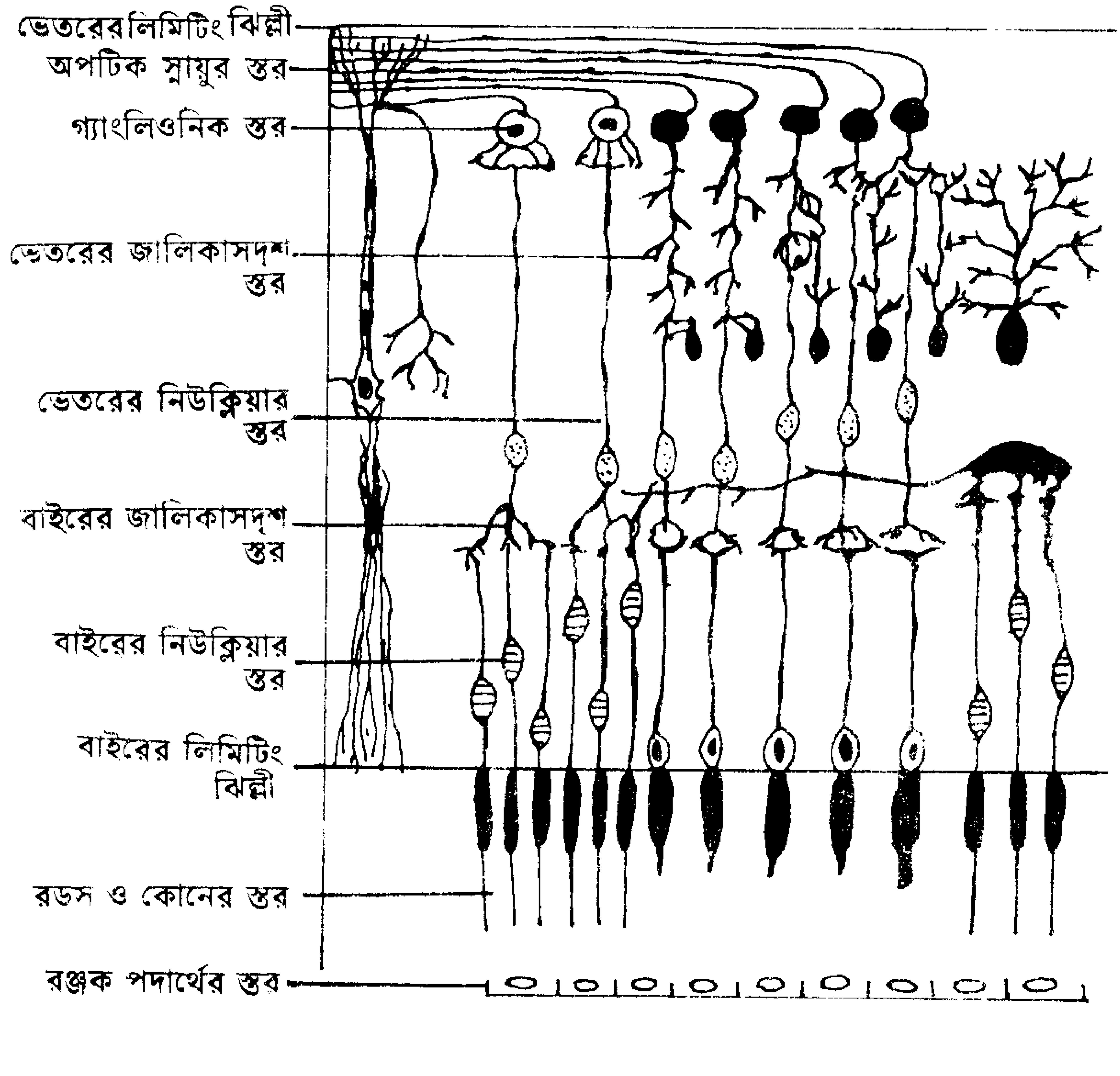

চিত্র ৫ : রেটিনার আণুবীক্ষনিক গঠন

ম্যাকুলা (Macula) : ম্যাকুলা–অক্ষিকৃষ্ণের শিরা ধমনী হতে রক্তসরবরাহ পায়। অক্ষিপুটে রক্ত সরবরাহ দু'ভাবে হয়। ভিতরে ০.৬৬ অংশ সেন্ট্রাল রেটিনাল ধমনী হতে রক্ত সরবরাহ পায় এবং বাইরের ০·৩৩ অংশ কোরিওক্যাপিলারি দিয়ে সরবরাহ পায়। রড কোষ

অল্প আলোতে এবং কোন কোষ বেশি আলোতে দেখতে সাহায্য করে। ম্যাকুলার মধ্যবর্তী স্থানকে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস (fovea centralis)' বলে। এতে প্রচুর পরিমাণে কোনকোষ বিদ্যমান, তিন ধরনের কোন কোষ বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের তৈরি যারা বিভিন্ন আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও কার্যক্ষমতা প্রকাশ করে। প্রাথমিক রঙ (primary colour) কতগুলো রঙের সংমিশ্রণ। কোনো কোনো কোন কোষ প্রায় ১৫০ প্রকারের রঙ সনাক্ত করতে পারে। রড কোষ অক্ষিপুটের অন্যান্য সকল অংশে রয়েছে যা সাধারণত রাতে দেখতে সাহায্যে করে। দেখার কোষগুলো যা আলোর প্রতি সংবেদনশীল তা রেটিন্যাল বা ভিটামিন এ দিয়ে তৈরি । এ রেটিন্যাল রড আমিষ, 'অপসিন'এর সাথে যুক্ত।

যখন আলো চোখে ঢোকে তখন এ দু'পদার্থ বিভক্ত হয়ে পড়ে, ফলে দেখার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। পরে অব্যবহৃত রেটিন্যাল বিপাকের মাধ্যমে পূর্বের আকার ধারণ করে ও 'অপসিনের" সাথে যুক্ত হয়। এটি ভিটামিন 'এ' হিসেবেও ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না রেটিন্যালে রূপ নেয়। রেটিনার প্রধান কাজ হলো দেখার প্রতিবিম্বকে গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়।

অপটিক স্নায়ু (Optic nerve) : অপটিক স্নায়ু দ্বিতীয় ক্রেনিয়াল স্নায়ু। এটি রেটিনার এক মিলিয়ন গ্যাংগলিওন কোষের তন্তু দিয়ে তৈরি। অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে চোখের অধোদেশ (fundus) পরীক্ষা করলে অপটিক স্নায়ুর মাথা অপটিক ডিস্ক (optic disc) হিসেবে দেখা যায়। এটির ব্যাস চোখের ভিতরে ১.৫ মি: মি: এবং চোখর বাইরে ৩মি মি: যখন ম্যায়ালিন মেমব্রেন দিয়ে আবৃত থাকে। অপটিক ডিস্কে কোনো রড বা কোন কোষ নেই। সুতরাং এ স্থানকে দৃষ্টিশক্তি পরিমণ্ডলের অন্ধবিন্দু (blind-spot) বলে। অপটিক স্নায়ু অপটিক নলাকার ছিদ্র দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং অপর পার্শ্বের অপটিক স্নায়ু সাথে মিলে অপটিক কায়াজমা (optic chaisma) তৈরি করে। এ স্নায়ু ৮০% ভাগ ভিস্যুয়াল ফাইবার যা লেটেরাল জেনিকুলেট বডিতে গিয়ে মিশে। অক্ষিতারার ফাইবার বা তন্তুগুলি ২০% ভাগ গিয়ে প্রিটেকটিয়াল এলাকায় পৌঁছে। যদি অপটিক স্নায়ু একবার ধ্বংস হয় তবে আর নতুনভাবে তৈরি হতে পারে না।

লেন্স (Lens) : লেন্স দ্বি-উত্তল বিশিষ্ট, রক্তনালী ও রক্ত সরবরাহ নেই। এটির ৬৫% পানি ও ৩৫% আমিষ এবং কিছু তড়িকাবহ পদার্থ (electrolyte) বিদ্যমান। এটির ভিতরে নিউক্লিয়াস, বাইরে করটেস্ক দ্বারা গঠিত (চিত্র ৬)। করটেক্সের বাইরে ক্যাপসুল বা বহিঃরাবণ আছে। লেন্সের করটেক্স দু'হাজার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ল্যামিনা বা স্তর দ্বারা তৈরি। এ ল্যামিনার সংযোগস্থল সামনের দিকে "Y" আকারের এবং পিছনে দিকে উল্টো λ আকারের। জনুযূল বা সাসপেনসরি বন্ধনী লেন্সের ইকুয়েটর বা প্রান্তের ক্যাপসুলের সাথে সংযুক্ত। এটি লেন্সকে কর্ণীনিকার পিছনে ধরে রাখে। সিলিয়ারি বডির মাংসপেশী সংকুচিত হলে সাসপেনসরি বন্ধনী ঢিলা হয়, এতে লেন্স আরও বেশি উত্তল হয়, ফলে প্রতিসরণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। এটির ফলে আলোক রশ্মি অক্ষিপুটে প্রতিবিম্ব তৈরি করে। কাছে ও দূরে দেখার জন্য লেন্সের এ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে অভিযোজন (accommodation) বলে। যখন এটি

ঘটে তখন অক্ষিতারা ছোট হয়। অক্ষিগোলকের মাংসপেশী একসাথে কাজ করে দুই অক্ষিপটেই প্রতিবিম্ব তৈরি করে। যখন লেন্সের বয়স বেড়ে যায় তখন এটির অভিযোজন ক্ষমতা কমে যায়। লেন্সের পিছন দিকে কাচীয় রস বিদ্যমান।

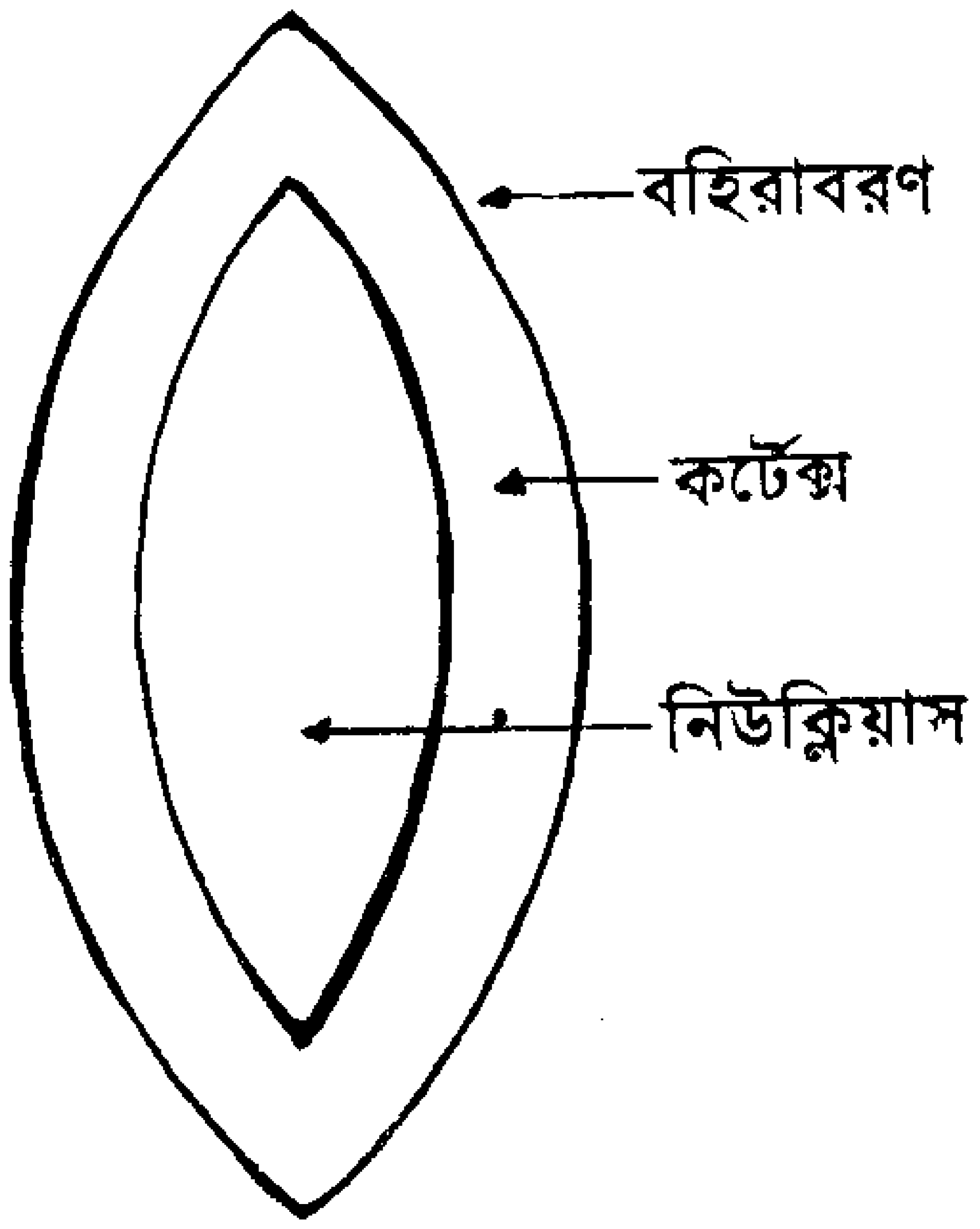

চিত্র ৬ : লেন্স

কাচীয় রস (Vitreous humour) : কাচীয় রস চোখের আয়তনের ০.৬৬ ভাগ এবং এটির আলোর প্রতিসরাঙ্ক লেন্সের প্রতিসরাঙ্কের সমান। এটির ৯৯ ভাগ পানি এবং ১ ভাগ কোলাজেন তন্তু এবং হায়ালুনারিক এসিড। এটির বাইরের তলে হায়ালয়েড ঝিল্লি যা লেন্সের পিছনের ক্যাপসুল, জনুয়ূল, সিলিয়ারি বডির মসৃণ অংশ, অক্ষিপট এবং অপটিক স্নায়ুর মাথা দিয়ে আবৃত। কাচীয় রসের গোড়া অত্যন্ত শক্তভাবে পার্সপ্লেনা ও ওরা-সেরেটাতে সংযুক্ত থাকে। মাতৃগর্ভে হায়ালয়েড নলে হায়ালয়েড ধমনী থাকে তা জন্মের পরপরই অবলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু হায়ালয়েড নালী জীবনভর থেকে যায়। কাচীয় রস চোখকে আকার দিতে সাহায্যে করে। এটি বেরিয়ে গেলে চোখ সংকুচিত হয়।

চোখের বাইরে গৌণ অঙ্গ হচ্ছে— (ক) অক্ষিপল্লব, (খ) নেত্রনালী, (গ) নেত্রবর্ত্ম (Conjunctiva), (ঘ) বাইরের মাংসপেশী (Extraocular muscle)

(ক) অক্ষিপল্লব (Eye lid)

চোখের বাইরে দুটি পর্দাসদৃশ অক্ষিপল্লব আছে যা বাইরের আঘাত হতে চোখকে রক্ষা করে। এটি একটি চোখের উপরে ও একটি চোখের নিচে থাকে। অক্ষিপল্লবে চামড়া খুব ঢিলা এবং অনেক স্থিতিস্থাপক কলা দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে অক্ষিপল্লবপুট (tarsal plate) যা ঘন

তন্তুময় কলা এবং অল্পকিছু স্থিতিস্থাপক কলা দিয়ে তৈরি। অক্ষিপল্লব ও অক্ষিকোটরের মাঝে অক্ষিকোটরের ব্যবধায়ক (septum) রয়েছে। একটি অংশ তন্তুময় আচ্ছাদনী (fasia) রয়েছে যা অরবিকুলারিস মাংসপেশীর নিচে থাকে।

গোলাকৃতি অরবিকুলারিস (orbicluaris oculi) মাংসপেশী সপ্তম স্নায়ু দিয়ে পরিচালিত যা অক্ষিপল্লবকে বন্ধ করে। লেভেটর পালপ্রেব্রি মাংসপেশী তৃতীয় স্নায়ূ দিয়ে সরবরাহ পায় যা অক্ষিপল্লবকে উপরে উঠায়।

খুব ছোট মুলার মাংসপেশী যা সমবেদী (sympathetic) স্নায়ু দিয়ে সরবরাহ পায়। এটি টারসাল প্লেটের উপরের প্রান্তে লাগানো থাকে। চোখের পাতায় তিন ধরনের গ্রন্থি আছে–

মেবোমিয়ান গ্রন্থি (meibomian glands) : এটি ঘর্ম–মেদস্নায়ু গ্রন্থি যা টারসাল প্লেটের মাঝে থাকে। এ গ্রন্থির নিঃসরণ অশ্রু আবরণের তৈলাক্ত আবরণ তৈরি করে। এটি উপরের পাতায় ২৫টি এবং নিচের পাতায় ২০টি থাকে।

জেইস গ্রন্থি (zeis glands) : এটি ঈষৎ পরিবর্তিত ঘর্ম–মেদস্রাবী গ্রন্থি যা চোখের পাঁপড়ির গূর্চিকার (follicle) সাথে যুক্ত।

মোল গ্রন্থি (glands of moll) : এটি সাধারণ স্বেদগ্রন্থি। চোখের পাঁপড়ি উপরের পাতায় ১৫০টি এবং নিচের পাতায় সাধারণত ৭৫টি থাকে। উপরের পাঁপড়িগুলো অবতল হয়ে উপরের দিকে খাড়া থাকে। নিচের পাঁপড়িগুলো উত্তল হয়ে নিচের দিকে করে থাকে। অক্ষিপল্লব অপথ্যালমিক, জাইগোমেটিক এবং কোনের ধমনী হতে রক্ত সরবরাহ পায়। লসিকাসমূহ (lymphatics) কানের আগে প্যারোটিড গ্রন্থিতে ও সাবম্যাক্সিলারি লসিকাগ্রন্থিতে নিঃসরিত হয়। পাতলা শ্লেষ্মাঝিল্লি যা অক্ষিপল্লবের পিছনের তলে লেগে থাকে। একে অক্ষিপল্লবের নেত্রবর্ত্ম বলে।

অক্ষিপল্লবের আণুবীক্ষণিক গঠন : অক্ষিপল্লবের আণুবীক্ষনিক গঠনে নিম্নলিখিত অংশ (চিত্র ৭) লক্ষ্য করা যায় —

১. চামড়া স্তর (the skin)
২. চামড়ার নিচের স্তর (subcautenous layer)
৩. মাংসের স্তর (a layer of straited muscle)
৪. মাংসের নিচের স্তর (the submuscular areolar tissue)
৫. অক্ষিপুট বা টারসাল প্লেট ও আঁশযুক্ত স্তর (the fibrious layer- including tarsal plate)
৬. খাঁজবিহীন মাংসের স্তর (a layer of non-straited muscle)
৭. নেত্রবর্ত্ম (the mucous membrane or conjunctiva)

চিত্র ৭ : চোখের পাতার লম্বচ্ছেদ

(খ). নেত্রনালী (Lacrimal apparatus)

অশ্রুসংবহনতন্ত্র দু'ভাগে গঠিত—একটি গ্রন্থি (lacrimal gland) এবং অপরটি নিঃসরণ পথ (drainage system) (চিত্র ৮)। ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি অক্ষিকোটরের ছাদের উপরে ও বাইরে দেওয়ালে গর্তে থাকে। এ গ্রন্থি ল্যাক্রিমাল রস নিঃসরণ করে যা নেত্রবর্ত্মের উপরের খিলানে অবস্থিত ১২টি নালীর মাধ্যমে নিঃসরিত হয় এবং চোখের ভিতরের কোণে আসে। এর পরে নিঃসরণ পথ শুরু হয়।

নিঃসরণ পথ নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে বিভক্ত (চিত্র ৮)–

১. ছিদ্রবিন্দু (Punctum) দুটি। উপরে একটি, নিচে একটি।
২. নালিকা— উপরে ও নিচে (Upper and lower canaliculus)
৩. সাধারণ নালিকা (Common canaliculus)
৪. অশ্রুথলি (Lacrimal sac)
৫. নাসাশ্রুনালী (Naso lacrimal duct)

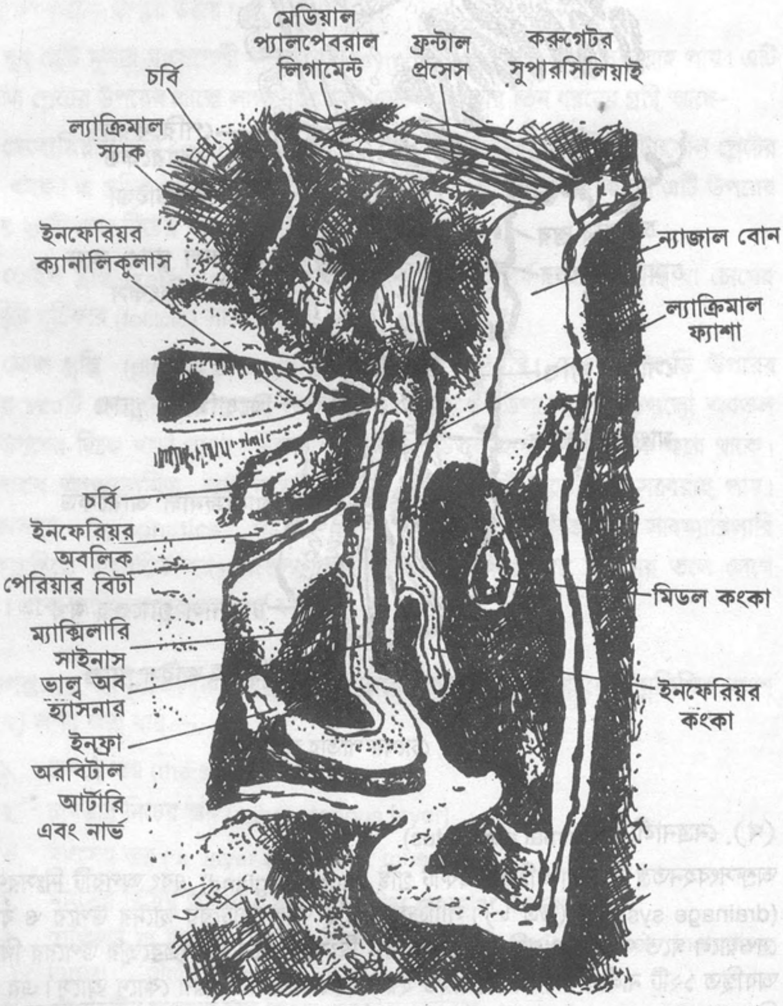

চিত্র ৮ : নেত্রনালী, ল্যাক্রিমাল স্যাক

অশ্রু চোখের ভিতরের কোণে আসার পর উপরের ও নিচের ছিদ্রবিন্দু দিয়ে উপরের ও নিচের নালিকার মাধ্যমে সাধারণ নালিকা দিয়ে অশ্রুথলিতে পৌছে। পরে নাসাশ্রুনালীর মাধ্যমে নাসারন্ধ্রের নিচের রন্ধ্রে শেষ হয়। ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি ছাড়াও ক্রাউজ ও উলফেরিং অতিরিক্ত ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি।

অশ্রুর কাজ

১. অশ্রু চোখকে ভেজা রেখে অক্ষিপল্লবকে এর উপরে দিয়ে যাতায়াতে সাহায্য করে।
২. এটি নেত্রস্বচ্ছের ও নেত্রবর্ত্মের ময়লাকে পরিষ্কার করে।
৩. এটি বাইরের বাতাস হতে অক্সিজেনকে ধরে কর্নিয়াকে পুষ্টি সরবরাহ করে।
৪. এতে লাইসোজাইম নামে এনজাইম আছে যা চোখের জীবাণুকে ধ্বংস করে।

(গ). নেত্রবর্ত্ম (Conjunctiva)

এটি একটি পাতলা পর্দা যা অক্ষিগোলককে অক্ষিপল্লবের সাথে যুক্ত করে। নেত্রবর্ত্মকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় তা নিম্নরূপ—

১. অক্ষিপল্লবের নেত্রবর্ত্ম (Palpebral conjunctiva
২. খিলানের নেত্রবর্ত্ম (The conjunctival fornix)
৩. অক্ষিগোলকের নেত্রবর্ত্ম (Bulbar conjunctiva)

অক্ষিপল্লবের নেত্রবর্ত্মের উপরে ও নিচে খিলান তৈরি করে পরে অক্ষিগোলকের নেত্রবর্ত্ম হয় যা হালকাভাবে টেননের ক্যাপসুলের ও নিচে শ্বেতপটলের সাথে লাগানো থাকে এবং লিম্বাসে শেষ হয়। অক্ষিগোলকের নেত্রবর্ত্ম মোটা হয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাঁজ তৈরি করে যা চোখের ভিতরের কোণে দেখা যায়। অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি ভাঁজের ভিতরে অর্ধুদিকা (caruncle) আছে। এতে লসিকানালী প্রচুর। এটি সামনের নেত্রবর্ত্মের ধমনী হতে রক্ত সরবরাহ পেয়ে থাকে যা সামনের সিলিয়ারি ধমনীর শাখা এবং পিছনের নেত্রবর্ত্মোর ধমনী হতে সরবরাহ পেয়ে থাকে তা পেরিফেরাল আরকেডের শাখা।

নেত্রবর্ত্মের আণুবীক্ষণিক গঠন

(১) **উপঝিল্লি :** এ উপঝিল্লি ভিটামিন 'এ'-র অভাবে কেরটিনাইজড উপঝিল্লি হয়। এ অংশে গবলেট (goblet) কোষ থাকে।

(২) **সাবস্টেনসিয়া প্রপ্রিয়া** (Substansia Propria) : এ স্তর মোটা, এ অংশে শিরা ধমনী ও স্নায়ূ থাকে।

(ঘ) চোখের বাইরের মাংসপেশী (Extra Ocurasc Muscle)

এগুলো ছটি মাংসপেশী যা চোখকে নাড়াচাড়া করায়। চারটি রেকটাস মাংসপেশী — উপরের, নিচের, পাশের ও মধ্যবর্তী যা গোলাকার কন্ডুরা হতে উৎপন্ন হয়—একে জিনের অ্যানুলাস (annulus of zinn) বলে। এরা শ্বেতপটলে সন্নিবেশ (insersion) হয়ে শেষ হয়। উপরের তির্যক মাংসপেশী (superior obligue muscle) অক্ষিকোটরের শীর্ষ হতে উৎপন্ন হয়ে নাকের দেওয়াল ট্রকলিয়া নামক গোলাকার কোমলাস্থির মাঝ দিয়ে যায়। পরে মাংসপেশী

টেন্ডন হয় যা উপরের রেকটাসের নিচ দিয়ে তির্যকভাবে অক্ষিগোলকের ইকুয়েটরের সামনে শ্বেতপটলে শেষ হয় (চিত্র ৯)। নিচের তির্যক মাংসপেশী (inferior obligue muscle) অক্ষিকোটরের মেঝে হতে উৎপন্ন হয়ে নিচের রেকটাস মাংসপেশীর নিচে দিয়ে অক্ষি-

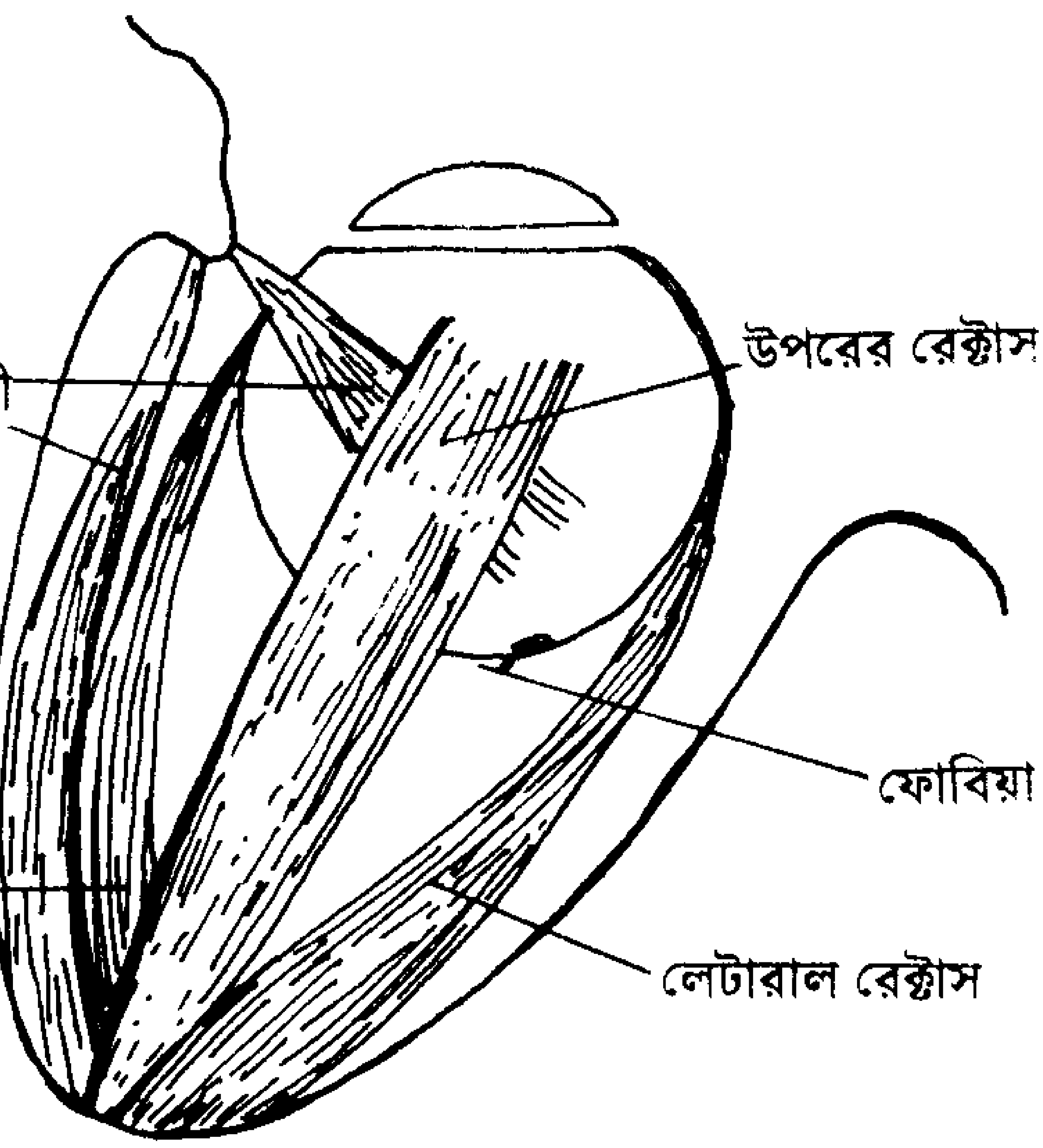

চিত্র ৯ : চোখের বাইরের মাংসপেশী

গোলকের ইকুয়েটরের পিছনে শ্বেত পটলে শেষ হয়। প্রত্যেক মাংসপেশীর তন্তুময় আচ্ছাদনী আছে, যা টেননের ক্যাপসুলের সাথে লাগানো রয়েছে। তিনটি মাংসপেশী যথাক্রমে উপরের, নিচের, মধ্যপার্শ্বীয় রেকটাস মাংসপেশী মস্তিষ্কের তৃতীয় স্নায়ূ দিয়ে সরবরাহ পায়। লেটেরাল রেকটাস মাংসপেশী অ্যাবডুস্যান্স (abducens) নামক মস্তিষ্কের ৬ষ্ঠ স্নায়ূ দিয়ে সরবরাহ পায় এবং ট্রকলিয়া নামক মস্তিষ্কে ৪র্থ স্নায়ু উপরের তির্যক মাংসপেশীকে সরবরাহ করে।

চোখের বাইরের মাংসপেশীর কাজ : মধ্যপার্শ্বীয় রেকটাস মাংসপেশী (medial rectus muscle) চোখকে নাকের দিকে টানে অর্থাৎ এটি অন্তঃচালক (adductor) বহিঃপার্শ্বীয় রেকটাস মাংসপেশী (letral rectus)। চোখকে বাইরের দিকে টানে অর্থাৎ এটি বহিঃচালক মাংসপেশী। উপরের রেকটাস মাংসপেশীর প্রাথমিক কাজ হলো চোখকে উপরে উঠানো এবং নিচের রেকটাস মাংসপেশীর প্রাথমিক কাজ হলো চোখকে নিচে নামানো। উপরের তির্যক মাংসপেশীর প্রাথমিক কাজ হলো চোখকে ভিতরের দিকে ঘোরানো। এটির গৌণ কাজ হলো নিচে নামানো ও বাইরের দিকে টেনে রাখে। নিচের তির্যক মাংসপেশীর প্রাথমিক কাজ হলো চোখকে বাইরে ঘোরানো এবং এটির গৌণ কাজ হলো চোখকে উপরের দিকে উঠিয়ে রাখে এবং বাইরের দিকে টেনে রাখে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা বলতে আমরা চোখের অতি সাধারণ রোগ নির্ণয়ের জন্য জ্ঞান, এর কিছু চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং প্রয়োজনবোধে রোগীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানো সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং কিছু সাধারণ চক্ষু-রোগের প্রতিরোধ (prevention) ব্যবস্থা নেওয়াকেই প্রাথমিক চিকিৎসা পরিচর্যা বলা হয়।

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার গুরুত্ব

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ চক্ষু একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গ। অতি সামান্য রোগেই এর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাই রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে চক্ষু রোগের মারাত্মক জটিলতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে উঠছে। এজন্যই প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার গুরুত্বের উপর ব্যাপক গণসচেতনার আন্দোলন শুরু হয়েছে। জনগণকে চক্ষু সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। তাদেরকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা নিজেরাই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক চক্ষু রোগের চিকিৎসা করতে সক্ষম হয়। যথাসময়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াও প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার একটি অংশ। আর এটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারলে একজন রোগী চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারানোর হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। এজন্য দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্ধত্বের কারণ ও নিবারণের উপায় সম্পর্কে সচেতনতাই প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার লক্ষ্য।

আঘাতজনিত চক্ষু অন্ধত্বের উপাদান

আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে আঘাতজনিত চোখের অন্ধত্বের হার অনেক বেশি। যন্ত্রের ঘূর্ণায়মান লোহার টুকরা, সিসা, দস্তা, সিলভার, কাচ প্রভৃতি ধাতু বা ধাতব পদার্থ চোখে আঘাত করে। বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে রোগী প্রতিনিয়ত ডাক্তারের কাছে আসে। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা করতে না পারলে চোখ অন্ধ হয়। এছাড়া কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্যেরও আঘাত পরিলক্ষিত হয়। কারখানার আঘাত ছাড়াও যানবাহন চলাচলের দুর্ঘটনার জন্যও চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। বিশেষত: তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য পীড়িত দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অনেক সময় মিটিং মিছিলে ইট-পাটকেল লাঠি-সোটা, দা-বল্লম, ছোড়া-কাঁচি ছাড়াও ককটেল, গ্রেনেড প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয়। এমনকি

সর্টগান ও এয়ারগান ব্যবহার করা হয়। এসব বন্দুকের ছড়াগুলো চোখের বিভিন্ন কলার ক্ষতি করে। ক্ষতির পরিমাণ বেশি হলে অন্ধত্ব অবধারিত। শিশুরাই হচ্ছে আঘাতজনিত অন্ধত্বের বড় শিকার। সূচাগ্র খেলনা, পেনসিল, কলমের নিব, ধনুক, তীর, গুলতি, ছুঁড়ে মারা কোন জিনিসের আঘাত দুর্ঘটনার কারণ। এ ছাড়াও বকের ঠোঁট, ছাগলের শিংঙের আঘাত, গরম পানি, গরম ভাতের ফ্যান, গরম ভাত ও উত্তপ্ত তেল প্রভৃতি পদার্থ অসাবধানতার কারণে শিশুর অন্যান্য অঙ্গের সাথে চোখ ও পুড়ে যায়। মাতৃদুগ্ধ পান করার সময়ে মায়ের দুধ শিশুর চোখে পড়ে চোখের রোগ হতে পারে।

তৃতীয় বিশ্ব তথা বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়জনিত কারণেও চক্ষু অন্ধ হয়। এ দৃশ্যটি বড় করুণ ও হৃদয় বিদারক। বিশেষ করে কিশোরী, তরুণী, ষোড়শী, তন্বী, বয়োপ্রাপ্ত মহিলারাই এর প্রধান শিকার। অনেকেই ব্যক্তিগত আক্রোশে অন্যের চোখে এসিড বা এসিডজাতীয় পদার্থ নিক্ষেপ করে। এই রাসায়নিক পদার্থ (acid ও alkali) চোখের অপূরণীয় ক্ষতি করে যার ফলে চক্ষু অন্ধ হয়। হিংসা-বিদ্বেষ ও ব্যক্তিগত আক্রোশে ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, আবাল-বৃদ্ধবণিতা এসিড নিক্ষেপ ছাড়াও অমানবিকভাবে জোরপূর্বক চক্ষু উৎপাটন করে। তারা সমাজে দুস্কৃতিকারী নামে অভিহিত।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা আশি ভাগ মানুষ কৃষি নির্ভরশীল। অনেক কৃষক অন্ধত্বের শিকার হচ্ছেন বিশেষত ধান পাতা ও ধানের আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত, ধান কাটার কাঁচি, বটি, হাঁসা, ছুড়ি প্রভৃতি দ্বারা। গরু মহিষের লেজের আঘাতেও চোখের ক্ষতি হয়। এ ছাড়াও রাস্তাঘাটে বাঁশের কুঞ্চি, খেজুর ও বরই গাছের কাঁটা, পোকামাকড়, ধূলাবালি ও আবর্জনার ভগ্নাংশ প্রভৃতি দ্বারা চোখের কর্নিয়াতে ক্ষত সৃষ্টি হলে তা তার উপসর্গের মাধ্যমে চক্ষু অন্ধ করে। এগুলো ধারাবাহিকভাবে আলাচেনা করা হলো।

চোখে আঘাত

চোখে আঘাত স্থূলভাবে নিম্নলিখিত কয়েকভাগে বিভক্ত—

(১) **যান্ত্রিক আঘাত :** যন্ত্র দ্বারা, যন্ত্রচালিত দ্রব্য দ্বারা যে আঘাত হয় তাকে যান্ত্রিক আঘাত বলে। এই যান্ত্রিক আঘাত আবার তিন ধরনের হতে পারে যথা- (ক) থেঁতলানো আঘাত (contusion injury) (খ) অন্তর্ভেদী ও ভেদক আঘাত (penetrating or perforating injury) (গ) বিজাতীয় বস্তু চোখের বাইরে থাকলে।

(ক) ভোতা অস্ত্র দ্বারা থেতলানো আঘাত

চোখের বিভিন্ন অংশের গঠন প্রণালী ও আঘাতের কম-বেশির উপর নির্ভর করে। তাই সচরাচরভাবে ঘটে এমন বিষয়গুলোর উপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

চোখের পাতার আঘাত (Eye lid) : চোখের পাতার আঘাত লাগলে নিম্নরূপ ক্ষতি হতে পারে।

* চোখের পাতা সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যেতে পারে।
* সামান্য চামড়া ছিঁড়তে পারে। এগুলোর সাথে নেত্রনালীর যে কোনো অংশ ছিঁড়তে পারে। বিশেষ করে নিচের নেত্রনালীর বিন্দু (punctum) এবং নিচের নেত্রনালীর নালিকা (canaliculus) বেশি ছিঁড়ে (চিত্র ১০ এবং ১১)।

চিত্র ১০ : উপরের অক্ষিপল্লবে আঘাতজনিত ক্ষত

চিত্র ১১ : নিচের পাতার নেত্রনালীর নালিকার ছেঁড়া অংশ

নেত্রবর্ত্মে আঘাত : নেত্রবর্ত্মের আঘাত লাগলে তা ছিঁড়ে যায় এবং এর নিচে রক্তপাত হয় (sub-conjunctival haemorrhage)।

* শ্বেতপটেলে (Sclera) আঘাত : শ্বেতপটল শুধু সাধারণভাবে ছিঁড়ে যেতে পারে।
* শ্বেতপটল ছিঁড়ে গিয়ে সিলিয়ারি বডি বের হয়ে যেতে পারে।
* অক্ষিতারার (pupil) গোল আকৃতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
* শ্বেতপটল ছিঁড়ে গিয়ে অক্ষিকৃষ্ণ (choroid) বের হয়ে যেতে পারে।
* শ্বেতপটল, অক্ষিকৃষ্ণ, অক্ষিপট ছিঁড়ে গিয়ে কাচীয় রস (vitreous humour) বের হয়ে যেতে পারে।

আচ্ছোদ পটল বা নেত্রস্বচ্ছের আঘাত (Corneal trauma)

* নেত্রস্বচ্ছের উপঝিল্লি সামান্য পরিমাণে উঠে যেতে পারে।
* অচ্ছোদ পটল সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যেতে পারে।
* অচ্ছোদ পটল সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গিয়ে কণীনিকা বের হয়ে আসে।
* অচ্ছোদ পটল ছিঁড়ে গিয়ে লেন্স বের হয়ে আসতে পারে
* লেন্স বের হলে কাচীয় রস বের হয়।

সামনের প্রকোষ্ঠের (Anterior chamber)

সামনের প্রকোষ্ঠে আঘাত লাগলে রক্তপাত হয়ে রক্ত জমা হয় (hyphaema) (চিত্র ১২) এ রক্ত আসে কণীনিকা ও সিলিয়ারি বডির রক্তনালীর ছেঁড়ার ফলে। অনেক সময় এতে চক্ষুর অভ্যন্তরীণ চাপ (Intraocular pressure) বেড়ে যেতে পারে এবং রক্ত বহুদিন ধরে জমা থাকলে নেত্রস্বচ্ছ রক্তবর্ণ ধারণ করে।

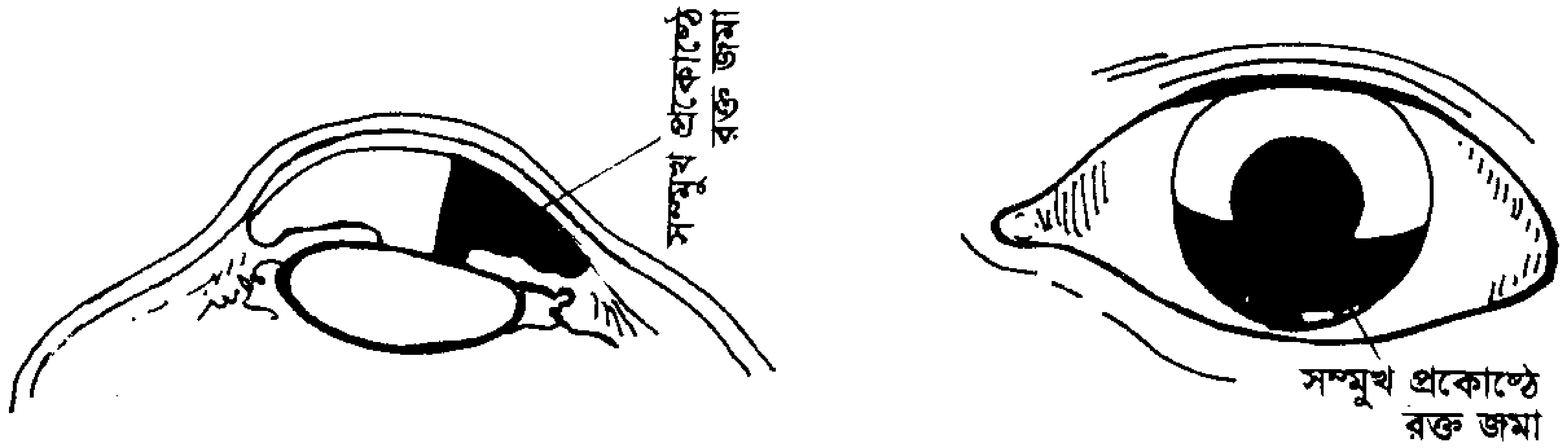

চিত্র ১২ : সামনের প্রকোষ্ঠে রক্তজমা

কণীনিকা ও চোখের তারার আঘাত : চোখের তারা আকৃতি পরিবর্তন হয়ে "ডি" আকার ধারণ করতে পারে, "পিয়ার" আকৃতি ধারণ করতে পারে ; তারা একদিকে সরে যেতে পারে, তারা বড় (mydriasis) ও ছোট (miosis) হয়ে যেতে পারে। কণীনিকার আঘাত লেগে কণীনিকার গোড়ায় সামান্য অংশ ছিড়ে যায়। কণীনিকাতে সামান্য কাপুনি হতে পারে। কণীনিকা প্রায় সম্পূর্ণ ছিড়ে যেতে পারে।

সিলিয়ারি বডিতে আঘাত : সিলিয়ারি বডি ছিড়ে যেতে পারে, ছেঁড়া বেশি হলে বের হয়ে আসতে পারে। এর ফলে সামনের প্রকোষ্ঠে রক্ত জমা হতে পারে এবং কাচীয় রসে রক্ত জমা হতে পারে।

লেন্স-এ আঘাত

* লেন্স ছানি পড়তে পারে।
* লেন্স তার স্থানে উল্টে বা সামান্য সরে যেতে পারে।
* লেন্স স্থানচ্যুত হতে পারে। এ স্থানচ্যুত দু'দিকেই হতে পারে। যথা—
  (১) সম্মুখের দিকে, সামনের প্রোকষ্ঠের দিকে।
  (২) পিছন দিকে কাচীয় রসের দিকে।
  (৩) নেত্রবর্ত্মের নিচে স্থানচ্যুত হতে পারে।

অক্ষিকৃষ্ণের আঘাত (choroid) **:** অক্ষিকৃষ্ণের আঘাত লেগে তা ছিঁড়ে যেতে পারে এবং অত্যধিক রক্তপাত হতে পারে।

অক্ষিপটের আঘাত : কমিশিও রেটিনি : হঠাৎ ঘুষি বা এরূপ কোনো আঘাত যা অক্ষিগোলকের সম্মুখভাগে লাগলে দেখা যায়।

* অক্ষিপট ছিঁড়ে যাওয়া (retinal tear)
* অক্ষিপটে রক্তপাত (retinal haemorrhage)
* অক্ষিপট বিচ্ছেদ (retinal detachment)

অক্ষিপট ছিঁড়ে যাওয়া : আঘাতজনিত কারণে কোনো এক জায়গায় রেটিনায় সম্পূর্ণ স্তরগুলি ছিঁড়ে ফাঁক হয়ে যায়। এর সাথে অক্ষিকৃষ্ণও ছিঁড়ে যেতে পারে। সে ছেঁড়া স্থানে শুধু সাদা শ্বেতপটল দেখা যায়।

অক্ষিপটের রক্তপাত (Retinal haemmorrhage) : আঘাতজনিত কারণে অক্ষিপটে যে রক্তপাত হয় তা অক্ষিপটের রক্তনালী ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে ঘটে।

অক্ষিপট বিচ্ছেদ (RD) : আঘাত লাগার ফলে অক্ষিপট ছিঁড়ে যায়, সেই ছেঁড়া ছিদ্র দিয়ে অক্ষিপটের নিচে তরল পদার্থ ঢোকে, ফলে অক্ষিপট বিচ্ছেদ হয়।

কাচীয় রসে আঘাত : আঘাতের ফলে কাচীয় রসে রক্তপাত হয় বা রক্তজমা হয়। ফলে রোগী হঠাৎ অন্ধত্বে ভোগে।

থেতলানো আঘাতের চিকিৎসা : আঘাত লাগার ফলে যদি "কালো চোখ" (black eye) হয় তবে ঠাণ্ডা বরফ লাগালে উপকার হয়।

চোখের পাতার আঘাত : চোখের পাতা ছিঁড়ে গেলে অস্ত্রোপচার করতে হয়। এর সাথে যদি নেত্রনালীর নালিকা ছিঁড়ে যায় তা অস্ত্রোপচার করে পুনর্গঠন করতে হয়।

নেত্রবর্ত্মের আঘাতের চিকিৎসা : নেত্রবর্ত্মের নিচে রক্তজমা হলে সাধারণত ২ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। রোগীকে রোগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে তার দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে।

শ্বেতপটের আঘাত : অস্ত্রোপচার করে পুনর্গঠন করতে হয়।

অচ্ছোদপটলের আঘাত : নেত্রস্বচ্ছের উপঝিল্লির সামান্য পরিমাণ উঠে গেলে প্যাড ও ব্যান্ডেজ দিতে হয়। সাথে ড্রপ ও মলম লাগাতে হয়। আঘাতের ফলে ঘা হলে Atropine ড্রপ দিতে হয়। সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গিয়ে কণীনিকা বের হয়ে আসলে অস্ত্রোপচার করে কণীনিকা কেটে দিয়ে অচ্ছোদপটল পুনর্গঠন করতে হয়।

সামনের প্রকোষ্ঠে আঘাতের চিকিৎসা : যদি সামনের প্রকোষ্ঠে রক্তজমা (hyphaema) হয় তাতে দুই চোখে প্যাড ও ব্যান্ডেজ দিয়ে রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে

হয়। চোখের ভিতরের চাপ সাধারণ চাপ অপেক্ষা বেশি হলে Acetazolamide বড়ি খাওয়াতে হয়। যদি সামনের প্রকোষ্ঠে সম্পূর্ণ রক্তজমা থাকে, চোখের উচ্চচাপ হয় তা হলে অস্ত্রোপচার (paracenthesis) করে রক্ত অপসারণ করা হয়। স্টেরয়েড ফোঁটা বা মলম ফোঁটা লাগতে হবে।

কণীনিকা ও সিলিয়ারি বডি : আঘাতের ফলে ছিঁড়ে গেলে অস্ত্রোপচার করতে হয়।

লেন্স আঘাতের চিকিৎসা : লেন্স ছানি পড়লে বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে নিডলিং অস্ত্রোপচার বা লেন্স বের করার জন্য অস্ত্রোপচার করতে হয়। লেন্স সামনের দিকে সামনের প্রকোষ্ঠের দিকে স্থানচ্যুত হলে অস্ত্রোপচার করে ভেকটিস দ্বারা বের করতে হয়। যদি পিছনের দিক স্থানচ্যুত হয়ে কাচীয় রসের মধ্যে পড়ে তবে তা রেখে দেওয়া উত্তম।

কাচীয় রসে রক্ত জমলে : ক্ষুদ্র রক্তপাত শোষিত হয়ে যায়। বৃহৎ রক্তপাত যখন শোষিত হয় না তখন ভিটট্রেকটমি অস্ত্রোপচার করতে হয়।

(খ) অন্তঃভেদী ও ভেদক আঘাত (Penetrating rerforting)

এই সকল আঘাত সাধারণত ধারালো বস্তু দ্বারা বা অত্যধিক গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা অথবা জোরে ধাবিত ভোঁতা বস্তু দ্বারা চোখের যেকোনো অংশ আক্রান্ত হয়। এ জাতীয় আঘাতে জীবাণু সংক্রমিত হওয়ার ভয় বেশি থাকে।

অন্তঃভেদী আঘাতের চিকিৎসা : প্রথমে স্থানীয় বহিঃতল অবেদনকারী ফোঁটা দিয়ে চক্ষু পরীক্ষা করতে হবে। অক্ষিপল্লব ফাঁক করার যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে ভাল হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অজ্ঞান করে পরীক্ষা করলে ভাল হয়।

যদি চক্ষু পরীক্ষা করে দেখা যায় আঘাত সাংঘতিক যা অক্ষিগোলককে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং সেখানে কোন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সময়ের মধ্যে অস্ত্রোপচার করতে হয়।

অস্ত্রোপচার করার পর Atropine-এর ফোঁটা, স্টেরয়েড ফোঁটা বা মলম দিতে হয়। মুখে বা মাংসে জীবাণু প্রতিরোধকারী ওষুধ দিতে হয়।

(গ) বিজাতীয় বস্তু চোখের বাইরে থাকলে

চোখের বাইরে বিজাতীয় বস্তু নেত্রবর্ত্মে ও নেত্রস্বচ্ছে গ্রথিত অবস্থায় থাকে (চিত্র ১৩)। বিজাতীয় পদার্থগুলো হচ্ছে কয়লার গুঁড়া, লোহার কুচি, ধানের গুঁড়া, কাঠের ছোট টুকরা প্রভৃতি। এ পদার্থগুলি চোখে পড়ার সাথে সাথে অস্বস্তি বোধ হয়। চোখে পানি পড়া শুরু হয় এবং বেদনার সাথে সাথে অক্ষিপত্রাক্ষেপ শুরু হয়।

চিত্র ১৩ : কর্নিয়ার বিজাতীয় বস্তু

চিকিৎসা : নেত্রবর্ত্মের ও নেত্রস্বচ্ছ বিজাতীয় পদার্থ বিশুদ্ধ সোয়াব শলাকা দিয়ে তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়। তার আগে স্থানীয় অবেদনকারী ফোঁটা দিতে হয়। যদি এতে না তোলা যায় তবে সূঁচ দিয়ে বা স্পাড (চিত্র ১৪) দিয়ে তুলে ফেলতে হয়। এন্টিবায়টিক ফোঁটা ও মলম দেওয়া হয়। যদি নেত্রস্বচ্ছে ঘা হয়, তবে Atropine ড্রপ বা মলম দিতে হয়।

বিজাতীয় বস্তু চোখের ভিতরে থাকলে

চোখের অভ্যন্তরীণ বিজাতীয় পদার্থগুলো সাধারণ চক্ষু গোলকের বিভিন্ন অংশ ভেদ করে ঢোকে —এ পদার্থগুলো হচ্ছে লোহার টুকরা, পাথরের টুকরা, গ্লাস, তামা, সীসা, সিলভার, কাঠের টুকরা প্রভৃতি। এ পদার্থগুলি চোখের ভিতরে প্রবেশ করে চোখে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়।

সৌভাগ্যক্রমে যে সমস্ত পদার্থ তাপ প্রাপ্ত হয় এবং সে সমস্ত ধাতু বিশুদ্ধ। অপরপক্ষে যেমন কাঠের টুকরা, পাথর, মাটি, প্রভৃতি জীবাণু সংক্রমিত করে যা চোখের ভিতরের অংশে প্রদাহ সৃষ্টি করে (endopthalmitis) এবং পরে সাংঘাতিক পুঁজ সৃষ্টিকারী সংক্রমণ চক্ষুর সমস্ত স্তরগুলোকে (panopthalmitis) আক্রমণ করে।

চোখের ভিতরে বিজাতীয় পদার্থ ঢুকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া করে না এমন পদার্থ হচ্ছে গ্লাস, প্লাস্টিক, প্লাটিনাম, পোরসেলিন, সিলভার, সোনা প্রভৃতি।

সীসা ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতু স্থানীয় উত্তেজনা (localirritant) সৃষ্টি করে। তামা (copper) একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উত্তেজক পুঁজজনিত প্রদাহের সৃষ্টি করে।

লোহা কলাতে নির্দিষ্ট অপজাত (specific degeneration) করে যাকে Sedarosis বলা হয়। কপার বা তামা বিভিন্ন কলাতে তলানি থেকে Chalcosis সৃষ্টি করে।

চিত্র ১৪ : ফরেনবডি স্পাড

চিকিৎসা

চিকিৎসা করার পূর্বে ইতিহাসের মাধ্যমে কি প্রকারের বিজাতীয় পদার্থ চোখের মধ্যে রয়েছে তা জানতে হবে। কারণ যে সমস্ত ধাতু যেমন লোহার চুম্বকের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে তা বের করা সহজ। বিজাতীয় পদার্থ কোথায় আছে তা জানতে হবে, এর জন্য স্লিট ল্যাম্প (slit lamp) দিয়ে চোখের অধোদেশ পরীক্ষা (fundus examination) করতে হয়। এ ছাড়া অক্ষিকোটরের বিভিন্ন প্রাকার X-Ray করতে হয়। চুম্বকের প্রতি আকর্ষণ ধাতুসমূহ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে হাত ব্যবহৃত চুম্বক ও বৃহৎ বৈদ্যুতিক (gaint elcetro magnet) সাহায্যে বের করা হয় (চিত্র ১৫)। যে সমস্ত ধাতুর চুম্বকের প্রতি আকর্ষণ নেই এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে না তা রেখে দেওয়া উত্তম। চুম্বকের প্রতি আকর্ষণ নেই এমন ধাতু যদি কাচীয় রসে থাকে তবে অস্ত্রোপচার করে বের করতে হয়।

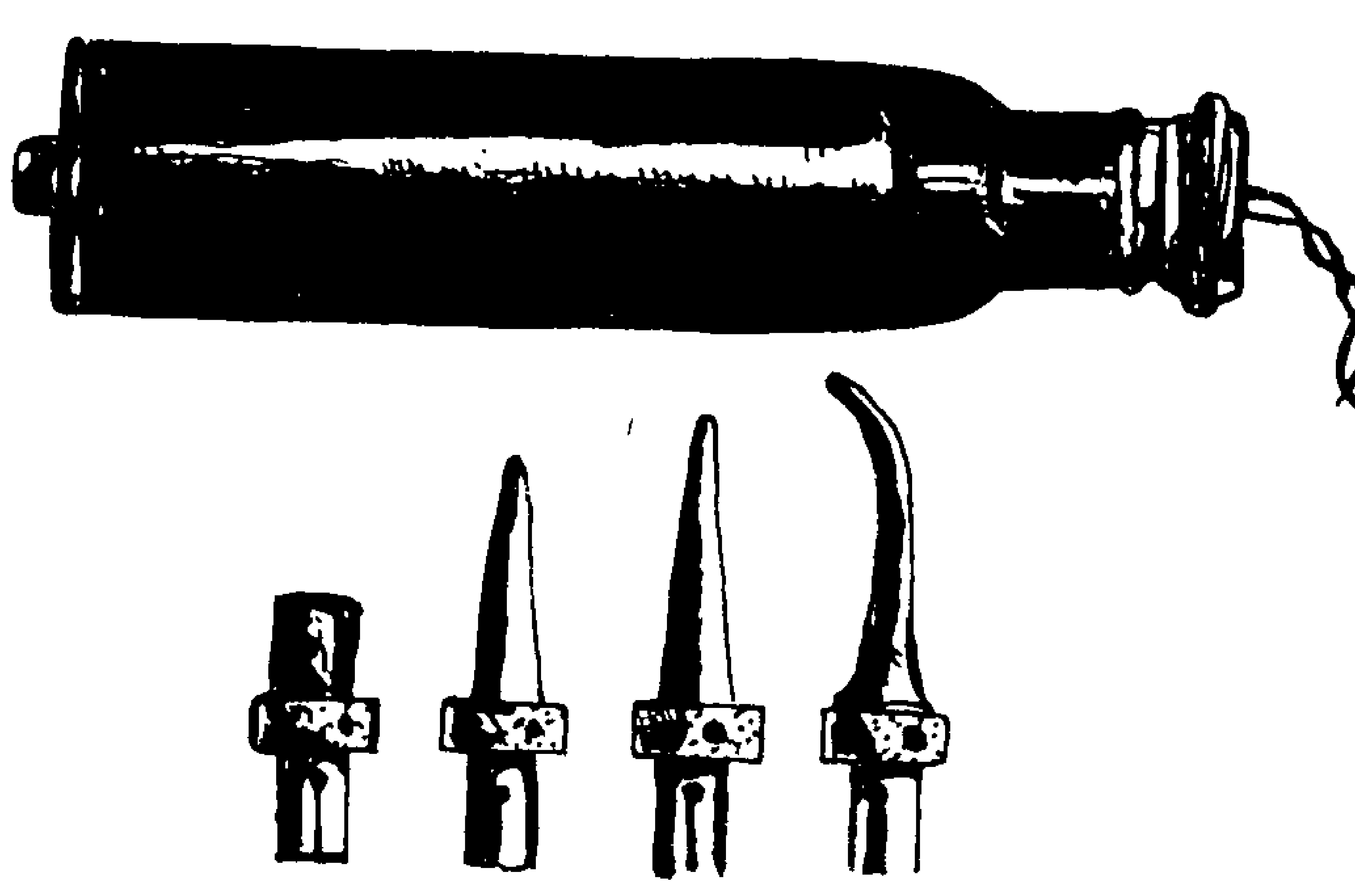

চিত্র ১৫ : হাত চুম্বক

(২) রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে পুড়ে যাওয়া

রাসায়নিক দ্রব্য যেমন কঠিন, তরল, পাউডার যখন চোখের সংস্পর্শে আসে তখন চোখ পুড়ে যায়। এটি সাধারণত স্কুল কলেজ পরীক্ষাগারে, কলকারখানায় ঘটে থাকে। এ ছাড়াও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপ ঘটনা আমাদিগকে দারুণভাবে পীড়া দেয়।

রাসায়নিক পদার্থসমূহ প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত

(ক) ক্ষারজাতীয় (alkali)

(খ) অম্লজাতীয় (acid)

(ক) **ক্ষারজাতীয় পদার্থে পোড়া :** ক্ষারজাতীয় পদার্থগুলো হচ্ছে চুন, কষ্টিক পটাশ অথবা কষ্টিক সোডা, তরল অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি। এটি এসিডজাতীয় পোড়া হতে অনেক বেশি ক্ষতিকারক। কারণ এটি কোষের আমিষ পদার্থকে জমাট বাঁধায় না। এটি কোষের পর্দা চর্বিকে সাবানে রূপান্তরিত করে কোষ প্রাচীরকে ধ্বংস করে কোষের চর্বিজাতীয় পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে দ্রবণীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় যা নরম আঠালো আমিষজাতীয় পদার্থবিশেষ। ক্ষারজাতীয় পদার্থ চোখে পড়লে নেত্রবর্ত্মে রক্ত পুঞ্জীভূত হয়, শোথ হয়, কলাসমূহ মরে যায় এবং পরবর্তীকালে অক্ষিপল্লববদ্ধতা (symblepharon) দেখা দেয়। নেত্রস্বচ্ছের উপর ঝিল্লি (epithelium) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে সাদা দাগ পড়ে এবং নতুন রক্তনালীর সৃষ্টি হয়। খুব খারাপ রোগীদের গোটা নেত্রস্বচ্ছ উঠে যায়, ফলে সম্মুখে অক্ষিপটল স্ফীত হয় (anterior staphyloma) কণীনিকায় খুব প্রদাহের সৃষ্টি হয়। খুব খারাপ রোগীর ক্ষেত্রে কণীনিকা ও সিলিয়ারি বডি রূপান্তরিত হয়ে ক্ষতান্তর কলা (Granulation tissue) তৈরি হয়। লেন্সে ছানি পড়ে। অক্ষিগোলকের শীর্ণতা দেখা (atrophy) দেয় (চিত্র ১৬)।

চিত্র ১৬ : ক্ষারজাতীয় পদার্থে চোখের পোড়া

(খ) এসিডজাতীয় পদার্থের পোড়া

এসিডজাতীয় পদার্থগুলো হচ্ছে সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি। অম্লজাতীয় পদার্থ চোখের পড়ার সাথে সাথে কোষের আমিষজাতীয় পদার্থ জমাট বেঁধে অদ্রবণীয় প্রোটিনেটস তৈরি করে। ফলে অতি তাড়াতাড়ি কোষ মরে যায় এবং জমাট বাঁধা মৃত পদার্থের (coagulation necrosis) সৃষ্টি হয়। এ জমাট বাঁধা প্রোটিন বাধা

সৃষ্টি করে ফলে গভীর কলার ক্ষতি করতে পারে না, ফলে ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকে। নেত্রবর্ত্মে কলা মরে উঠে যায় এবং পরে তন্তু উৎপাদন অক্ষিপল্লবের বদ্ধতা দেখা যায়। নেত্রস্বচ্ছ নষ্ট হয়ে অক্ষিপটল স্ফীত হয়।

রাসায়নিক পোড়ার চিকিৎসা

রাসায়নিক পদার্থ চোখে পড়লে সাথে সাথে পরিষ্কার পানি বা স্বাভাবিক লবণ পানির দ্রবণ (normal saline) দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। যদি দুই চোখে হয় তবে বালতি ভর্তি পানির মধ্যে মাথা ডুবোনো যেতে পারে (চিত্র ১৭)।

যদি কোনো চুন কোথাও লেগে থাকে তবে সোয়াব শলাকা দিয়ে তুলে ফেলতে হয়। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা উত্তম। অ্যাট্রপিন, এন্টিবায়টিক ড্রপ, স্টেরয়েড ড্রপ ব্যবহার করতে হয়। অক্ষিপল্লবের বদ্ধতা প্রতিরোধের জন্য গ্লাস সেল বা গ্লাস রড নেত্রবর্ত্মে খিলানে (fornix)এর ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১৭ : রাসায়নিক পদার্থে পোড়া চোখ ধৌতকরণ

চোখের সংক্রামক রোগের প্রাথমিক পরিচর্যা

চোখের প্রধান সংক্রামক অসুখসমূহ ও তার জটিলতা প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কিরূপে করা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) ট্রাকোমা (Trachoma)
(খ) উদরাময় বা ডায়রিয়া (Diarrhoea)
(গ) হাম, ফেরা বা নুনতি (Measles)
(ঘ) জলবসন্ত ও গুটিবসন্ত (Chiken pox and small pox)
(ঙ) ডিপথেরিয়া (Diptheria)
(চ) যক্ষ্মা (Tuberculosis)
(ছ) কুষ্ঠ (Leprosy)
(জ) যৌনব্যাধি (Sextually transmitted disease)
(ঝ) এইডস (AIDS)

(ক) ট্রাকোমা : ট্রাকোমা একটি দীর্ঘস্থায়ী নেত্রবর্ত্মের–নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহ যা *Chlamydia trachomatis* জীবাণুর সাহায্যে হয়ে থাকে (চিত্র ১৮)। এটি পৃথিবীতে অন্ধত্বের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত। প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ মিলিয়ন জনগণ এ ব্যাধিতে ভোগে এবং এর মধ্যে ১–২% অন্ধত্বে ভোগেন। এ রোগ সবচেয়ে বেশি হয় আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে, যেখানে মানুষের জীবন ধারণ প্রণালী অত্যন্ত নিম্নমানের।

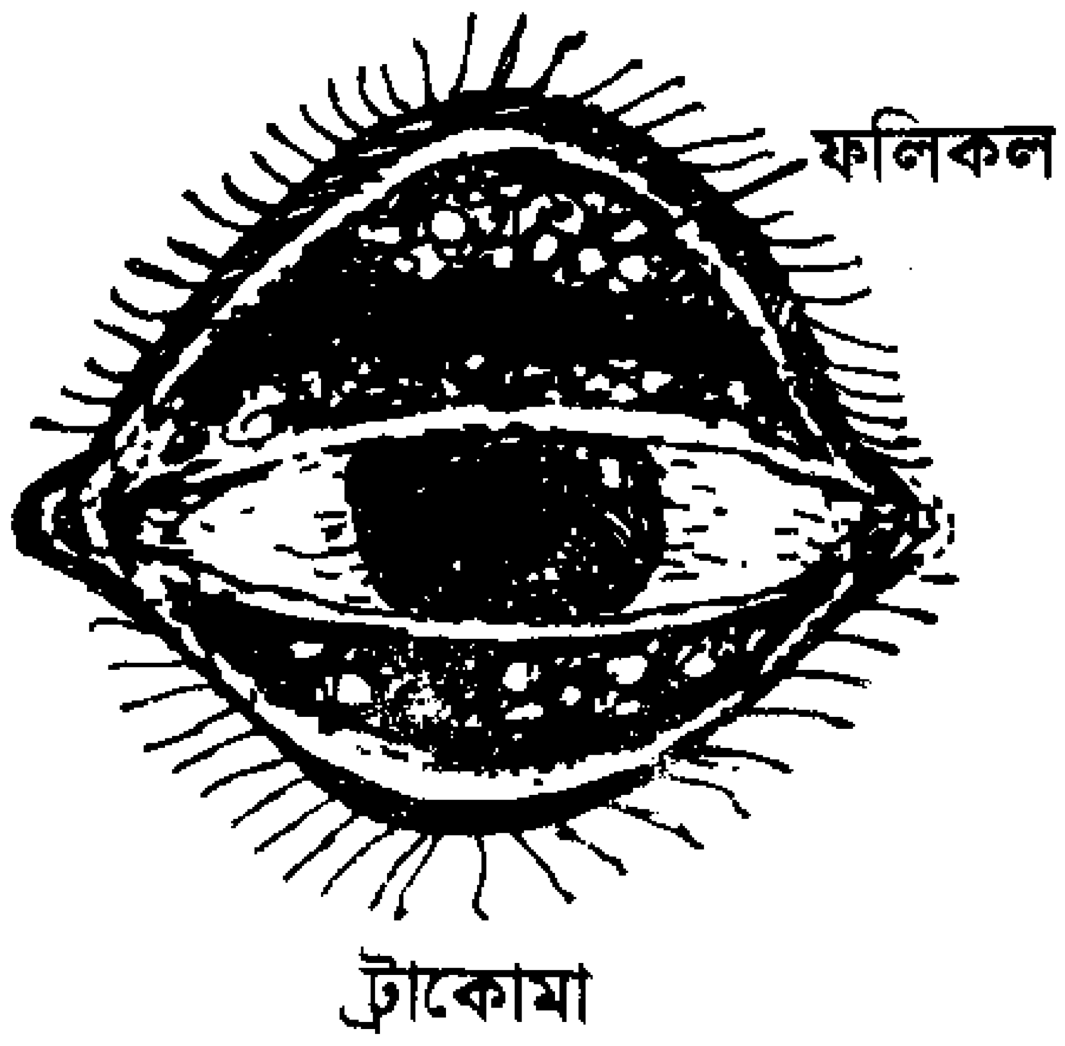

চিত্র ১৮ : ট্রাকোমা (অক্ষিপল্লবের ফলিকুল দেখানো হয়েছে)

এ রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করতে গেলে জীবাণু প্রতিরোধী ওষুধ ছাড়াও সংক্রমণ উৎসেরও মূলোৎপাটন করতে হবে। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার উন্নতির মাধ্যমে এর বিস্তারও পুনঃসংক্রমণ বন্ধ করা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে মাছির নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের পরিচর্যা এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

(খ) উদরাময় : উদরাময় হচ্ছে কতকগুলো অসুখ যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বারবার পাতলা পায়খানা ও শরীরে পানিশূন্যতা। উদরাময়ের কারণ অনেক। সাধারণ কারণগুলো হলো– কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর, জিয়ারডিয়ার সংক্রমণ, ভাইরাসজনিত ও কৃমিজনিত পাতলা পায়খানা।

শুষ্ক চোখ ও অক্ষিপল্লব বন্ধ করতে না পারার জন্য যে নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহ হয় তা উদরাময় অসুখের জটিলতার কারণে।

উদরাময় অসুখের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

চিকিৎসা : জলশূন্যতা (dehydration) নিরাময়ের জন্য মুখে অথবা শিরায় স্যালাইন দিতে হয়। সাথে জীবাণুরোধী ওষুধ ক্ষেত্রবিশেষে কৃমির ওষুধ দেওয়া হয়। শুষ্ক চোখের জন্য ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দেওয়া হয়। নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পয়:প্রণালীর ব্যবস্থাকরণ যা স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া দরকার। কলেরা, টাইফয়েড ব্যাধির জন্য টিকা প্রদান করতে হয়।

(গ) হাম : হাম একটি স্ফোটকজ্বর যা হাম ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে। এ ধরনের অসুখে জ্বরের সাথে এক বিশেষ ধরনের রক্তদানা বা পিত্তানি চামড়ায় দেখা দেয়। হাম চোখের শ্লেষ্মাজাতীয় নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ সৃষ্টি করে। পরে নেত্রস্বচ্ছের উপরিভাগে নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহ সৃষ্টি করে এতে অনেক সময় নেত্রস্বচ্ছে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

হামের টিকা দ্বারা হাম প্রতিরোধ করা যায়। হামের টিকা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির অধীনে —যাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সক্রিয় অনুমোদন আছে।

(ঘ) জল বসন্ত ও গুটি বসন্ত : গুটি বসন্ত সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা হয়েছে, ফলে গুটিবসন্ত কোথাও হয় না। জল বসন্ত হারপিস ভাইরাসের সংক্রমণে সৃষ্টি হয়। হারপিস জোস্টার ভেরিসিলা নামক ভাইরাস দ্বারা সংক্রেমিত হয়। সারা গায়ে স্ফোটক উঠে। চোখে দানা (granule) দেখা যায়। এটি ফেটে গিয়ে নেত্রস্বচ্ছ ঘা হয় ও নেত্রস্বচ্ছে ছিদ্র হয়। যারফলে অন্ধত্ব হয়।

এ রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হলে রোগীকে পৃথক করতে হয়, গৌণ (secondary) সংক্রমণকে প্রতিরোধ করা দরকার। স্কোটকের লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা করতে হয়। জলবসন্তের কোনো প্রতিষেধক নাই।

(ঙ) ডিপথেরিয়া : এটি একটি তীব্র সংক্রামক রোগ যা *Cornebacterium diphtheria* নামক জীবাণু দিয়ে হয়ে থাকে। এ রোগের বিশেষত্ব হলো যেখানে জীবাণুর সংক্রমণ থাকে সেখানে একটি স্থানীয় আবরণ বা ঝিল্লী (membrane) তৈরি করে। এটি সাধারণত বাচ্চাদের হয়ে থাকে। এ জীবাণু আমাদের চোখে ঝিল্লী বা আবরণ তৈরিজনিত নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে।

এ রোগের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের উপায় হলো অতি তাড়াতাড়ি রোগ সনাক্ত করা। রোগীকে পৃথক স্থানে রাখা, রোগীর চিকিৎসা এবং ডিপথেরিয়ার টিকা গ্রহণ।

(চ) **যক্ষ্মা :** যক্ষ্মা একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ যা *Mycobacteriam tuberculosis* জীবাণু দ্বারা হয়ে থাকে। এ অসুখ উন্নয়নকামী দেশের একটি প্রধান স্বাস্থ্যহানির সমস্যা। এ জীবাণু চোখে নেত্রবর্ত্মে ও নেত্রস্বচ্ছে বুদবুদজনিত প্রদাহ (Phlyctenular keratoconjunctivitis) কনীনিকা, সিলিয়ারি বডি, অক্ষিকৃষ্ণের প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে। এ ছাড়া শ্বেত পটলের প্রদাহ, অক্ষিপটের রক্তনালীর (vasculitis retinae) প্রদাহ এবং অক্ষিকৃষ্ণের যক্ষ্মা সৃষ্টি করে থাকে।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ক) রোগের পূর্বাবস্থায় রোগ নির্ণয়

খ) জীবাণুরোধী ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা ও

গ) টিকা প্রদান

(ছ) কুষ্ঠ রোগ : কুষ্ঠ একটি সংক্রামক রোগ যা *Mycobacterium leprosy* নামক জীবাণু দ্বারা হয়ে থাকে। এ জীবাণু চামড়ার দেহের বহিরাংশের স্নায়ুতন্ত্র চোখের সম্মুখ অংশেই বেশিরভাগ আক্রান্ত করে থাকে। এ জীবাণু চোখের অক্ষিপল্লবের চামড়ার নিচে দানা, চোখের ভ্রূ পড়ে যাওয়া, নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ, নেত্রস্বচ্ছের উপরিভাগের বিন্দু চিহ্নিত (S.P.K) প্রদাহ, নেত্রস্বচ্ছের অনুভূতিহীনতা, শ্বেতপটলের প্রদাহ, শ্বেতপটলের নিচে বুদবুদ, কনীনিকায় প্রদাহ প্রভৃতি সৃষ্টি করে থাকে।

কুষ্ঠ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত

ক) রোগের পূর্বাহ্নেই রোগ নির্ণয় (early diagnosis)

খ) আক্রান্ত রোগীকে পৃথককরণ।

গ) কুষ্ঠ বিরোধী জীবাণুনাশক দ্বারা চিকিৎসা। ও

ঘ) এ রোগের বিস্তার রোধকল্পে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।

(জ) যৌন রোগ : বিভিন্ন প্রকার যৌনরোগ হতে পারে; যেমন–

সিফিলিস : এ রোগ অতি সংক্রামক এবং যৌন সঙ্গমের ফলে বিস্তার লাভ করে। *Treponema pallidum* নামক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রাথমিক স্তরে যৌন ব্যাধিজনিত ক্ষত অক্ষিপল্লবে ও নেত্রবর্ত্মে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় স্তরে ইউভিয়ার প্রদাহ হয়ে থাকে। সিফিলিসের তৃতীয় পর্যায়ে (tertiary stage) অক্ষিকৃষ্ণের প্রদাহ, অপটিক বা ২য় কেন্দ্রীয় স্নায়ুর প্রদাহ ও কাচীয় রসে অস্বচ্ছতা সৃষ্টি করে। উপদংশার্বুদ (gumma) কনীনিকা ও সিলিয়ারি বডিতে হয়ে থাকে। চোখের বাইরের মাংসপেশী অনেক সময় অবশ হয়ে যায়। জন্মগত সিফিলিস নেত্রস্বচ্ছের মধ্যবর্তী কোষকলায় প্রদাহ সৃষ্টি করে।

গনোরিয়া : গনোরিয়া gonococcus নামক জীবাণু দ্বারা হয়। এ রোগ যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। মায়ের গনেরিয়া থাকলে প্রসবকালে বাচ্চাদের দেহে তা সংক্রমিত হয়। এ সংক্রমণের ফলে শিশুদের অতি তীব্র পুঁজজনিত নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এ জীবাণু দ্বারা বেশি বয়সীদেরও নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ সৃষ্টি করে।

গনোরিয়া ও সিফিলিস ব্যাধি একটি সামাজিক সমস্যা। এ রোগ যেহেতু যৌন সঙ্গমের ফলে বিস্তার লাভ করে, তাই দৈহিক অবৈধ্র মিলন পরিহার করা উচিত। এটির মূলত সংক্রমণের স্থান পতিতালয় ও ক্লাব যেখানে অবাধে দৈহিক মিলনের সুযোগ থাকে। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য আমাদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

প্রথমত : দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এ মারাত্মক রোগটি সহজভাবেই দমন করা যায়। তা হলো আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে খোদাভীতির লাগাম জুড়ে দেওয়া। ইসলামী বিধানমতে যেনাহ্ একটি কবিরা গোনাহ্। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এ খোদাভীতিই এ রোগ দমনের জন্য যথেষ্ট। নিজেকে গোনাহ্গার ভাবা এবং তওবা করে যৌনাচার থেকে ফিরে আসাই হলো অতি শক্তিশালী পন্থা।

দ্বিতীয়ত : সরকারি উদ্যোগে পতিতালয় উচ্ছেদ ও তাদেরকে সঠিক কর্মে পুনর্বাসিত করা।

তৃতীয়ত : রোগীর পূর্ণ চিকিৎসা। অনেক রোগী কিছুটা রোগমুক্ত হলেই মনে করে থাকেন যে, তার রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু তার রক্তে জীবাণু রয়ে যায়। এজন্য রক্ত পরীক্ষা করে চিকিৎসকগণ এ সন্দেহ দূর করে থাকেন।

চতুর্থত : এ রোগের বিস্তার ও সংক্রমণের ভয়াবহতা প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ।

(ঞ) এইডস : এটি একটি ভাইরাসঘটিত ঘাতক ব্যাধি। Retrovirus দ্বারা হয়ে থাকে। আগে এটিকে T-cell, Lymphotrophic Virus type III (HTLV-III), ও *Lymphodenopathy Associate* Virus (L. A. V) বলা হত. এখন একে Human Immundeificiency Virus (HIV) বলা হয়ে থাকে।

এ ভাইরাস সাহায্যকারী টি–সেলকে ধ্বংস করে দৈহিক রোগ প্রতিরোধ কমিয়ে দেয়। ফলে বহুবিধ সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এ ব্যাধি অসংযত যৌনাচার, দূষণযুক্ত রক্ত ও সুচ, বীর্য ও লালা দিয়ে সংক্রামিত হয়ে থাকে। গর্ভাবস্থায় 'মা' থেকে শিশুতে সংক্রমিত হয়। এ ঘাতক ব্যাধি সমস্ত অঙ্গকে আক্রমণ করে। এ ব্যাধিতে ক্যানসার বেশি হয়, বিশেষ করে *Kaposis sarcoma*। এ ঘাতক ব্যাধির লক্ষণসমূহ হচ্ছে রক্তশূন্যতা, ডাইরিয়া যা সহজে সারে না, যকৃত ও প্লীহা বড় হওয়া, লসিকাগ্রন্থি আক্রান্ত হওয়া, দীর্ঘমেয়াদী candida সংক্রমণ, ক্রমাগত বা বারবার বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ, গায়ে লাল দাগ দেখা দেওয়া, ফুসফুসের প্রদাহ প্রভৃতি। এইড্স্ রোগে আক্রান্ত ৭৫% রোগীর চোখের অসুখ দেখা দেয়। এগুলো হচ্ছে অক্ষিপল্লবে ও নেত্রবর্ত্মে *Kaposis sarcoma*। এ ছাড়া কাচীয় রসে প্রদাহ, ইউভিয়ায় প্রদাহ, রেটিনায় রক্তক্ষরণ প্রভৃতি। এ রোগে *Cytomegali* ভাইরাস সংক্রমণের ফলে রেটিনায় প্রদাহ (CMV Retinitis) হয় ফলে চক্ষু অন্ধ হয়ে যায় এবং পরে রোগী নিশ্চিতভাবে মৃত্যুবরণ করে। কারণ এ রোগের সঠিক কোনো ওষুধ নাই এবং রোগের কোন প্রতিরোধক ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয় নি।

চিকিৎসা : পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এইডস রোগের সঠিক কোন চিকিৎসা নাই। এ ঘাতক রোগ যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। ইসলাম অবৈধ, অসংযত যৌনাচারের মূলে কুঠারাঘাত করে। তাই ইসলামী বিধিনিষেধ পালন করলে যৌনাচারের মাধ্যমে সংক্রমিত এইডস ব্যাধি বিস্তার লাভ করতে পারবে না। যারা ওষুধের প্রতি আসক্ত তারা একই সুচ

অনেকজনে ব্যবহার করে থাকে। ওষুধের প্রতি আসক্ত এবং একই সুচ ব্যবহার থেকে বিরত থাকলে এ ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়া যায়। এইডস ভাইরাস দূষণযুক্ত রক্ত শরীরে নেয়া যাবে না। এ রোগীর বীর্য, লালাও দূষণযুক্ত। তাই এসব দূষণযুক্ত পদার্থ থেকে দূরে থাকতে হবে। চোখে CMV দ্বারা রেটিনায় প্রদাহ হলে শিরায় dihydroxypropoxy methyl guine দিতে হয়। *Kaposis sarcoma*–এ রেডিওথেরাপিতে উপকার হয়।

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা সেবার পদ্ধতি (Primary Eye Care Delivary system)

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে সম্পৃক্ত। এটি গ্রাম পর্যায়ে মাঠ কর্মীদের (village health worker) দ্বারা শুরু হয়ে থাকে। এ কাজের সুবিধা ও সর্বাধিক ফল পাওয়ার জন্য আমরা এটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করতে পারি।

১. গ্রাম পর্যায়ের মাঠে কাজ (field work at village level)
২. থানা পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র (primary centre at thana level)
৩. দ্বিতীয় পর্যায়ের জেলা হাসপাতালে (secondary centre at district hospital)
৪. তৃতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (tertiary centre at medical college hospitals.) : চক্ষু ইনস্‌টিটিউট, পি.জি. হাসপাতাল প্রভৃতি (eye instititute, P.G. hospital.)

১. গ্রাম পর্যায়ে মাঠে কাজ

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এটি প্রকারান্তরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, পারিবারিক পর্যায়ে এবং সামাজিক পর্যায়ে শুরু হয়। অল্প কথায় প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা গ্রাম থেকে প্রথম শুরু হয়। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রতি ইউনিয়নে কর্মরত আছেন। তাদেরকে চোখের সাধারণ অসুখের প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা সাধারণ চোখের অসুখ সনাক্ত করতে পারে এবং তার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে বা থানা হাসপাতালে সঠিক সময়ে প্রেরণ করতে পারে। তাদেরকে চক্ষুরোগের প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিম্নলিখিত চোখের সাধারণ অসুখসমূহ সম্বন্ধে বর্ণনা করা নপ্রয়োজন :

১. লাল চোখ ও তার অসুখসমূহ
২. চোখ দিয়ে পানি পড়া
৩. চোখ দিয়ে ময়লা বা পুঁজ পড়া
৪. চোখ খচ্‌ খচ্‌ করা, চুলকানো, জ্বালাপোড়া করা, বালি বালিভাব প্রভৃতি
৫. চোখ ব্যথা

৬. চোখ ফুলে যাওয়া
৭. চোখের কম দেখা
৮. রাতকানা ও
৯. বাঁকা বা টেরা চোখ।

এ পর্যায়ের কর্মীরা যাতে নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ, নেত্রস্বচ্ছের ঘা, অশ্রুথলির প্রদাহ, ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত চোখ, অঞ্জনি নেত্রবর্ত্মের নিচে রক্ত পুঞ্জিভবন, চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের রক্তপাত প্রভৃতি সনাক্ত করতে পারে তার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তারা যেন সাধারণ অসুখের চিকিৎসা দিতে পারে এবং জটিল রোগীকে থানা হাসপাতালে রেফার্ড করতে পারে তার জন্য জ্ঞান দিতে হবে।

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের নিকট নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি থাকা আবশ্যক।

১. টর্চ লাইট
২. দূরে ও কাছের পড়ানো চার্ট (চিত্র ১৯)
৩. পিনহোল ডিস।
৪. ট্রায়াল ফ্রেম (চিত্র ২০)
৫. কিছু ওষুধ—যেমন জীবাণু প্রতিরোধী ড্রপ, মলম ইত্যাদি। পোস্টার, লিফলেট (poster and leaflet) চক্ষুর রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রচারকার্যে ব্যবহৃত হবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকেও যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হলে প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা করতে পারে।

(ক) গ্রামডাক্তার, পল্লী চিকিৎসক, (খ) সমাজকর্মী, (গ) নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, (ঘ) মসজিদের ইমাম এবং (ঙ) অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী দল।

২. থানা পর্যায়ে প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র

থানা হাসপাতাল হচ্ছে চোখের রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র। সেখানে একজন মেডিক্যাল অফিসারের পদ থাকা উচিত যিনি চক্ষুরোগের উপর ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তিনি চোখের রোগ সনাক্ত করবেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। জটিল রোগীকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন।

প্রাথমিক কেন্দ্রে উপকরণাদি

১. ট্রায়াল কেস (চিত্র ২১)
২. ১টি অফথ্যালমোস্কোপ (চিত্র ২২)
৩. ১ টি রেটিনোস্কোপ (চিত্র ২৩)

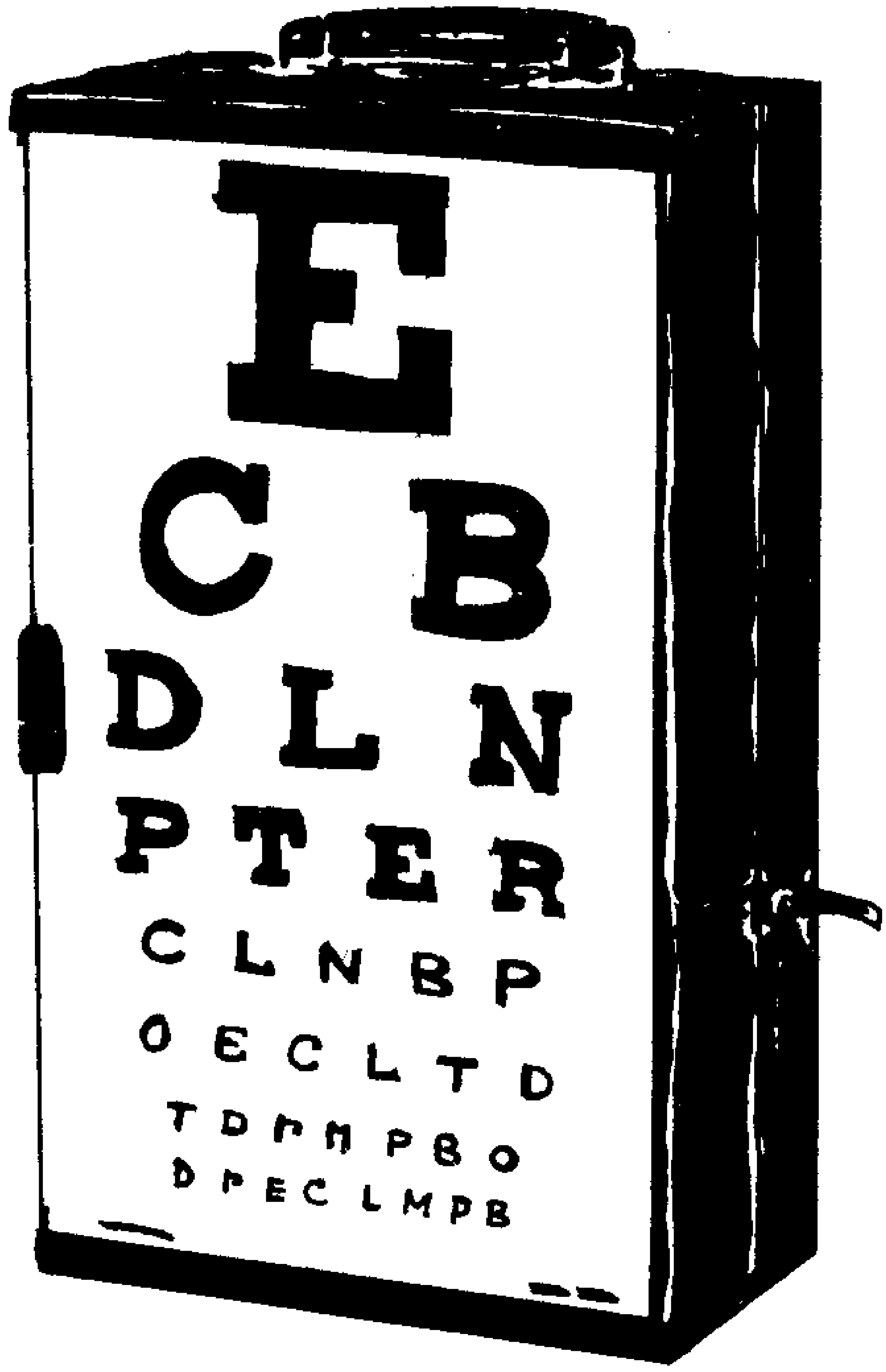

চিত্র ১৯ : স্নেলেনের চার্ট

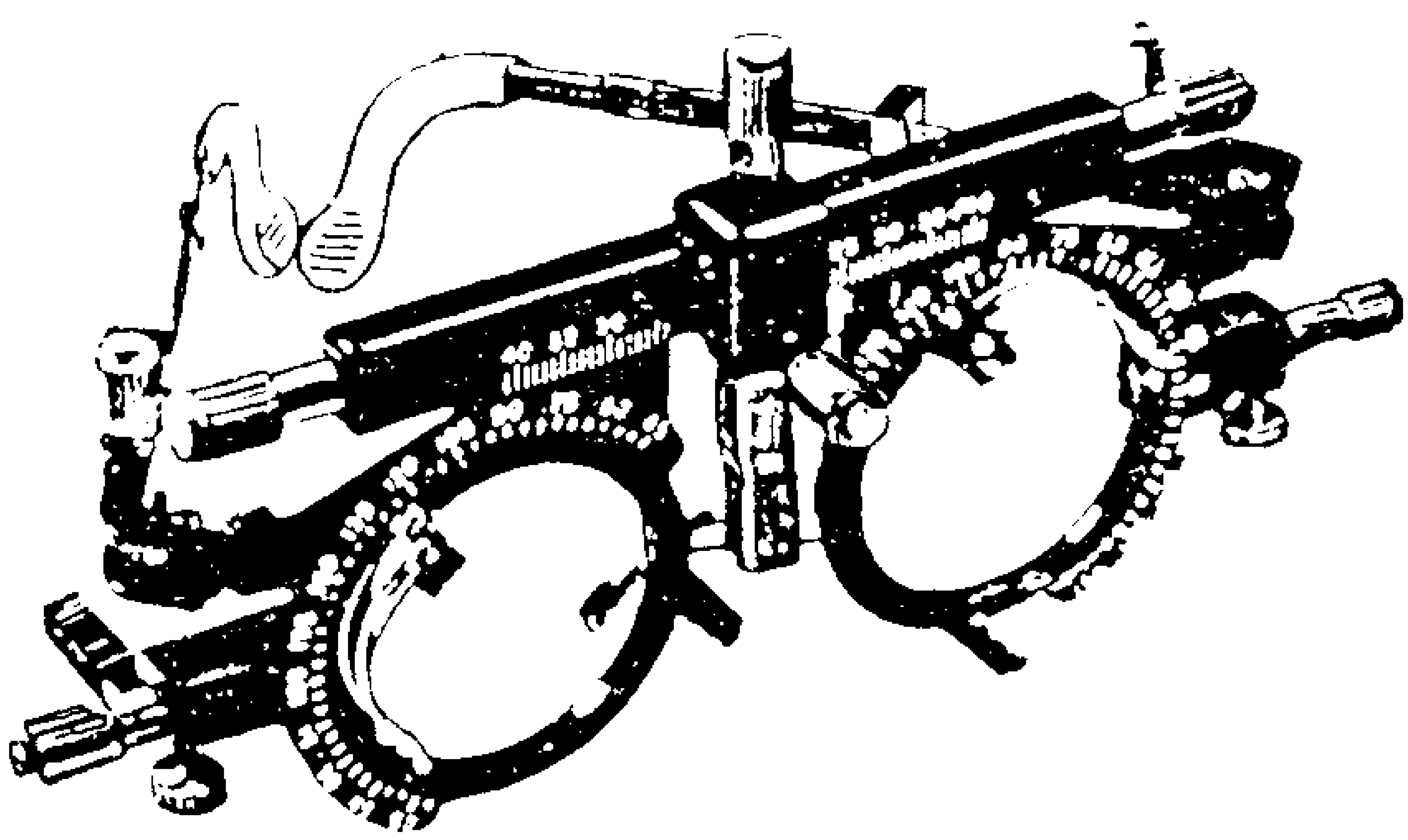

চিত্র ২০ : ট্রায়ালফ্রেম

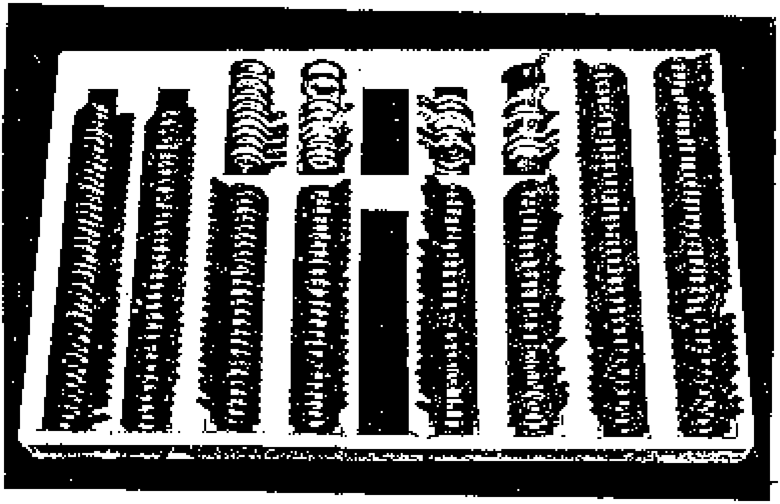

চিত্র ২১ : ট্রায়ালকেস

চিত্র ২২ : অফথালমোস্কোপের সাহায্যে চোখ পরীক্ষা

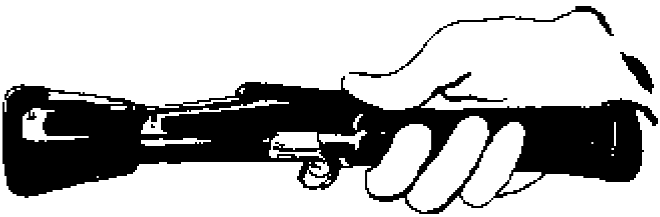

চিত্র ২৩ : রেটিনোস্কোপ

৪. টোনোমিটার
৫. প্রাথমিক পর্যায়ের অস্ত্রোপচারের যন্ত্রসমূহ।
৬. ভিটামিন 'এ', এন্টিবায়োটিক ড্রপ, মলম, এট্রোপিন পাইলোকারপিন প্রভৃতি ওষুধ ও
৭. এ সব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিছু প্যারামেডিক্সদেরও প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলা হাসপাতাল কেন্দ্র

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার চিকিৎসার দ্বিতীয় পর্যায়ের কেন্দ্র হলো জেলা হাসপাতাল। এখানে একজন চক্ষু উপদেষ্টা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার ও প্যারামেডিক্স থাকবেন। এখানে চোখের সাধারণ রোগের চিকিৎসা ছাড়াও বড় সকল অস্ত্রোপচারের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকবে। চক্ষু উপদেষ্টা প্রয়োজনবোধে চিকিৎসার জন্য রোগীকে তৃতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রে পাঠাবেন।

৪. তৃতীয় পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কেন্দ্র

তৃতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে দেশের সকল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, চক্ষু ইন্সটিটিউট, পি.জি. হাসপাতাল প্রভৃতি। এখানে প্রফেসর, সহযোগী প্রফেসর, সহকারীপ্রফেসর, রেজিস্ট্রার, সহকারী রেজিস্ট্রার, মেডিক্যাল অফিসার কর্মরত থাকেন। এখানে চিকিৎসায় সকল উপকরণাদি রয়েছে। এখানে সকল রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা ছাড়াও প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

সেমিনার ও ওয়ার্কশপ : চক্ষুরোগের সাধারণ জ্ঞান ও তার চিকিৎসা, প্রতিরোধের জন্য দেশের মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেজন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়।

ক. প্রাথমিক চক্ষুপরিচর্যার জন্য পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট, প্রভৃতি প্রকাশ করা এবং এটি বিতরণ করা।

খ. মাঠকর্মীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ।

গ. প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি, ওষুধ প্রভৃতি সরবরাহকরণ

চোখের প্রাথমিক পরীক্ষা

১. চোখের বিভিন্ন অংশের সাধারণ পরীক্ষা : টর্চলাইটের সাহায্যে এ পরীক্ষা করা যায়।

২. দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা : এ পরীক্ষার জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার চার্ট প্রয়োজন। এ চার্টটি রোগী হতে বিশ ফুট দূরত্বে থাকে প্রথমে এক চোখ বন্ধ করে খোলা চোখ দিয়ে চার্টের অক্ষর উপর থেকে নিচের লাইনে পড়তে হয় পড়তে না পারলে পিনহোল ডিস্ক দিয়ে পড়তে বলা হয় এবং তা দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষার ঘরে লিখতে হয়। অনুরূপভাবে অপর চোখ বন্ধ করে পরীক্ষা সম্পন্ন করাতে হয় সবচেয়ে নিচের লাইনে দৃষ্টিশক্তি ৬/৬ স্বাভাবিক। তার উপরের লাইনগুলোতে দৃষ্টিশক্তি ক্রমান্বয়ে ৬/৯, ৬/১২, ৬/১৮, ৬/২৪, ৬/৩৬ এবং ৬/৬০।

৩. রঞ্জক পদার্থ দ্বারা পরীক্ষা (Fluorescein Stain) : কর্নিয়াতে অতিক্ষুদ্র 'ঘা' এ-পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। চোখে এক ফোঁটা রঞ্জক পদার্থ (fluorescein) দিয়ে রোগীকে চোখ বন্ধ করতে বলতে হবে। তারপর লবণ পানির দ্রবণ (normal saline) দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়। কর্নিয়াতে সবুজ দাগ লেগে থাকলে কর্নিয়ার 'ঘা' আছে বুঝাতে হয় (চিত্র ২৪)।

চিত্র ২৪ : রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে চোখ পরীক্ষা

৪. আঙ্গুলের সাহায্যে চোখের চাপ নির্ণয় : এ পদ্ধতিটি চোখের উচ্চচাপ (glaucoma) নির্ণয়ের জন্য করা হয়.

রোগীকে তার পায়ের নিচের দিকে দেখতে বলে পরীক্ষাকারী দুহাতের নির্দেশক অঙ্গুলের সাহায্যে চোখের উপরের পাতায় চাপ দিবেন।

যদি দুচোখ শক্ত মনে হয় অথবা এক চোখ অন্য চোখ থেকে বেশি শক্ত মনে হয় তাহলে চোখে উচ্চচাপ হয়েছে মনে করে তৎক্ষণাৎ চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয় (চিত্র ২৫)

চিত্র ২৫ : আঙুলের সাহায্যে চোখের চাপ পরীক্ষা

৫. অশ্রুথলির জল নিষ্ক্রমণের পথ ঠিক আছে কিনা তার পরীক্ষা (Sac Patency test) : এ পরীক্ষার সাহায্যে Lacrimal drainage-এ কোথাও বন্ধ আছে কি-না তা সাধারণভাবে নির্ণয় করা হয়। চোখে স্থানীয় অবশকারী ওষুধ দিয়ে নেত্রবিন্দু প্রসারিত করে ক্যানুলা সংযুক্ত রঙিন পানি ভর্তি সিরিঞ্জ (Syringe) দিয়ে পরীক্ষা করতে হয়।

ক্যানুলা নেত্রবিন্দু দিয়ে নিচের নালিকায় প্রবেশ করিয়ে সিরিঞ্জের পিছনে ধীরে ধীরে চাপ দিলে পানি গলায় চলে আসবে।

যদি Lacrimal drainage system বন্ধ থাকে তবে পানি নাকে বা গলায় আসবে না (চিত্র ২৬)।

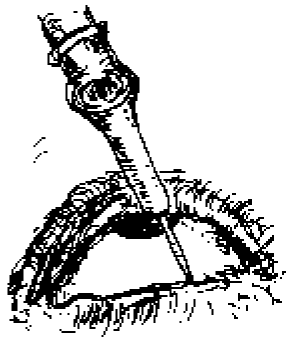

চিত্র ২৬ : স্যাক পেটেন্সি পরীক্ষা

৬. চোখ নড়াচড়ার পরীক্ষা (Ocular molility test) : টেরা চোখ (squint), রোগী যখন একটি বস্তুকে দুটি দেখছে বলে তখন এ পরীক্ষা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে। চোখের

চিত্র ২৭ : চোখ নড়ে কি-না তার পরীক্ষা

মাংসপেশীর দুর্বলতা, আঘাত অথবা অন্য কারণে স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য চোখের বিভিন্ন দিকে নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকে না।

পরীক্ষা পদ্ধতি : রোগীর সামনে বসে পরীক্ষাকারীর একটি আঙ্গুল রোগীর চোখের সামনে রেখে রোগীকে তাকাতে বলতে হবে। এবারে পরীক্ষাকারী তার আঙ্গুল ডানে-বামে, উপর-নিচে নাড়াবেন এবং সাথে সাথে রোগীর চোখ নড়ে কিনা দৃষ্টি রাখবেন। অবশ থাকলে চোখ নড়বে না। এ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ রোগীকে উন্নততর কেন্দ্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. দৃষ্টি পরিমণ্ডলের পরীক্ষা (Confrontation test of visual field) : এ পরীক্ষা মুক্তকোণ গ্লুকোমা (wide angle glucoma), চোখের স্নায়ু রোগ, রেটিনার রোগ, মস্তিষ্কের টিউমার নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক বিন্দুর দিকে তাকিয়ে আমরা চারপাশে যে দৃশ্যমান জগৎ দেখি সেটি হলো দৃষ্টিশক্তির পরিমণ্ডল (visual field)। এটি বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে করা হয়। তবে "প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার" জন্য নিচের পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

পরীক্ষা-পদ্ধতি : রোগী এক চোখ হাত দিয়ে বন্ধ করে পরীক্ষকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। পরীক্ষক রোগী থেকে ২ ফুট দূরত্বে বসে এক চোখ বন্ধ করে রোগীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারপর পরীক্ষক একটি কলম হাতে নিয়ে দূর হতে ধীরে ধীরে চোখের দিকে নিয়ে আসবে। রোগী ও পরীক্ষক এক সাথে পরীক্ষকের কলম দেখতে পেলে স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমা আছে বলে বুঝতে হবে।, এভাবে ডানে-বামে, উপরে-নিচে বিভিন্ন দিকে পরীক্ষা করতে হবে (চিত্র ২৮)।

চিত্র ২৮ : দৃষ্টিমণ্ডলের পরিধি পরীক্ষা

ভ্রাম্যমাণ চক্ষু চিকিৎসা সেবা দলের মাধ্যমে প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা (Primary eye care through mobile team)

ভ্রাম্যমাণ চক্ষু চিকিৎসা সেবাদল বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জের জনসাধারণের চিকিৎসা প্রদান করবেন। তাঁদের সাথে রোগ নির্ণয়ের সকল ব্যবস্থা থাকবে। তাঁরা রোগ নির্ণয়ের পর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রদান করবেন। যদিও এ চিকিৎসা সেবা স্থায়ী ব্যবস্থা নয় তবু এটি প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যাকে পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে ভ্রাম্যমাণ চক্ষু চিকিৎসক সেবা দল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে "চক্ষু ক্যাম্পের" (eye camp) মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন। এ চক্ষু ক্যাম্প দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে লোকসংখ্যা বেশি ও জনগণের অংশ আশাব্যঞ্জক এবং ক্যাম্প করার মতো প্রয়োজনীয় জায়গা আছে। স্কুল বা কলেজে ক্যাম্প করা যেতে পারে। অস্ত্রোপচার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে এবং স্থানীয় আসবাবপত্র হতে টেবিল জোগাড় করতে হবে। ভ্রাম্যমাণ চক্ষু চিকিৎসক সেবা দল ছানি রোগের অস্ত্রোপচার করবেন এবং অন্যান্য ছোট ছোট অস্ত্রোপচার করবেন। অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যবহৃত প্যাড, সোয়াবশলাকা, অটোক্লেভ সাথে নেবেন। যন্ত্রগুলো স্থানীয়ভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায় সেগুলো পানিতে ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। অস্ত্রোপচারের পর একজন স্থানীয় চক্ষুরোগে অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখাশুনার দায়িত্বে থাকবেন। রোগীকে সার্বক্ষণিক দেখাশুনার জন্য চক্ষু প্যারামেডিক্স থাকবেন। এভাবে রোগীকে কয়েক দিন দেখাশুনার জন্য প্যারামেডিক্স থাকবেন। রোগী সুস্থ হলে চশমা দিয়ে ছাড়পত্র দিয়ে দেবেন।

অস্ত্রোপচারের ফলে যদি জটিলতা দেখা দেয় তখন রোগীকে খুব শীঘ্র উচ্চতর কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন। প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যাকে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে গেলে জনগণকে চক্ষু স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে। সেজন্য ভ্রাম্যমাণ চক্ষু চিকিৎসক সেবা দল স্থানীয় জনগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। সেজন্য তারা পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট বিতরণ করবেন। স্থানীয় ডাক্তার, পল্লী চিকিৎসক স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী, নেতা, কর্মী, ইমাম, সকলকেই অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এসব জনগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্য হতে রোগী নিয়ে "চক্ষু ক্যাম্পে" আসবেন। "চক্ষু ক্যাম্প" চিকিৎসা সেবায় সাফল্যলাভ করবে। এভাবে বাংলাদেশের সকল অংশে চক্ষু চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব।

প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার প্রশিক্ষণ (Training of personnel for ophthalmic services)

১. প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রশিক্ষণ (ইউনিয়ন সাবসেন্টার পর্যায়ে) : বাংলাদেশে ইউনিয়ন সাবসেন্টারে একজন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োজিত আছেন এবং সেখানে প্যারামেডিকস ফার্মাসিস্ট, এম.এল.এস.এস. আছে। তৎসঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে এফ. ডব্লিউ. এ (F.W.A) এফ.ডব্লিউ. ভি. (F.W.V.) নিযুক্ত আছেন। চক্ষু চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তার

সপ্তাহের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে ইউনিয়নের ডাক্তার কর্মচারী, জনগণ, স্কুল শিক্ষক, ইমাম, গ্রাম ডাক্তারগণকে প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে পারেন। যেখানে সাবসেন্টার ঘর নেই সেখানে প্রাথমিক স্কুল ঘর ব্যবহার করা যেতে পারে। স্কুলের ব্ল্যাক বোর্ড, চক, ডাস্টার, একটি সুবিধাজনক সহজ মাধ্যম। এ সময়ে চোখের সাধারণ রোগের উপর পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট বিতরণ করা যেতে পারে।

২. থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ : থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন চক্ষুরোগের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক থাকা প্রয়োজন। তিনি থানার সব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চক্ষু বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। তৎসঙ্গে সাধারণ রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করবেন।

৩. জেলা হাসপাতালে প্রশিক্ষণ : জেলা হাসপাতালে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত আছেন। তিনি তাঁর জেলার অন্তর্গত সকল থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন করে ডাক্তার ও প্যারামেডিক্স নার্সকে, জেলা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রশিক্ষণ স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

৪. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বা চক্ষু ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ : বাংলাদেশে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, পি.জি. হাসপাতাল চক্ষু বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য M.C.P.S., D.O., F.C.P.S., M.S. প্রভৃতি কোর্স চালু করেছে। সম্প্রতি বারডেমে চক্ষু বিশেষজ্ঞ তৈরির কোর্স চালু করেছে। ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এখানে হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসার সাথে সাথে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা করা হয়। এসব ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও আলোচনা সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানরত ডাক্তার, প্যারামেডিক্স, নার্সকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রয়োজনবোধে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান দানের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের রিফ্রেসার কোর্সেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের কারণ ও চিকিৎসা

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. পরিবেশগত

২. অর্থনৈতিক

৩. শারীরিক

(ক) মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি শিশুকে শক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস করা।

(খ) ডায়রিয়া, (গ) হাম, (ঘ) কৃমির সংক্রমণ।

৪. সামাজিক কৃষ্টিগত অভ্যাস

(ক) ভাল অভ্যাস, (খ) খারাপ অভ্যাস

৫. অশিক্ষা ও অজ্ঞতা

১. পরিবেশগত

পরিবেশগত অন্ধত্বের একটি বড় কারণ হচ্ছে বিভিন্ন ঋতুতে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার সমানভাবে পাওয়া যায় না। সহজে বছরের অন্যান্য সময় যেমন ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ফল ও শাক-সবজি পাওয়া যায়, বর্ষার শেষে পল্লীর জনগণ তেমন পায় না। যার ফলে বর্ষাকালে ফসল কাটার আগে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বেশি হয়।

২. অর্থনৈতিক

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের কারণ খাবারে ভিটামিন 'এ'–এর অভাব। দারিদ্র্যতাই এর জন্য দায়ী। বেশিরভাগ লোকই তাদের সন্তানকে ভিটামিন 'এ'–যুক্ত খাবার দিতে পারেন না বাংলাদেশের শতকরা ৬০ জন ভূমিহীন। তারা শ্রমে যে নগদ মজুরী পায় তাতে কোনো রকমে হয়ত চাল কেনাই সম্ভব হয়ে উঠে না তাই স্বাভাবিকভাবেই ভিটামিন 'এ'–যুক্ত খাবার কিনতে পারেন না।

গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক লোকের মোরগ–মুরগি ও গরু ছাগল আছে। কিন্তু তারা টাকা উপার্জন করার জন্য ডিম ও দুধ সাধারণত বিক্রি করে থাকে। অনেকের শাক সবজি ফল–মূল চাষ করার জন্য যথেষ্ট আবাদী জায়গাও আছে। কিন্তু এ কাজ করার মতো সচেতনতা তাদের নেই। শহরের বস্তি এলাকাতে সবজি বাগানের জন্য কোনো জায়গা নেই এবং বেশিরভাগ লোক কোনো গবাদি পশু পোষে না। গ্রাম ও শহর এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা যেমন বেকারত্ব, নিম্নমানের চাকুরি এবং পরিবার বিভক্তি, যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন প্রভৃতি শক–

সবজি ও ফল-মূলের মতো খাদ্য ক্রয় করার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম ও শহর এলাকায় মেয়েদের নিরক্ষরতা একটি প্রধান সমস্যা।

যে সকল মায়েরা স্কুলে যায়নি তাদের পরিবারেই অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বেশি দেখা যায়। যে মায়েরা পড়তে জানেন না এবং সুষম খাদ্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পাননি তাদের শিশুদের অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে সকল মায়েরা স্কুলে গেছেন সে সব মায়েদের শিশুদের চেয়ে চার গুণ বেশি।

৩. শারীরিক

ক. মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি শিশুকে শক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস : ত্রুটিপূর্ণভাবে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো এবং ত্রুটিপূর্ণভাবে শক্ত খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস করানো অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। কোনো কোনো মা সন্তানকে

চিত্র ২৯ : বুকের দুধের পাশাপাশি বাচ্চাকে শক্ত খাবার খাওয়ানো

২ বছর বয়স পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ দিয়ে থাকে এবং অনেকেই আধাশক্ত খাবার হিসেবে সন্তানকে কেবল ভাত বা নরম জাউ খাইয়ে থাকেন অথচ এতে কোনো ভিটামিন নেই। বাড়ন্ত শিশুদেরকে ৪ থেকে ৬ মাস বয়স হতেই ভিটামিন 'এ'-যুক্ত শাক-সবজি ও ফল খাওয়ানো প্রয়োজন (চিত্র ২৯)।

খ. ডায়রিয়া : একজন শিশুর যতোবার পাতলা পায়খানা হয় ততোবারই যকৃতে যে সামান্য পরিমাণ ভিটামিন 'এ' মজুদ থাকে তা ব্যবহৃত হয় এবং নিঃশেষ হয়ে যায়। এমন কি ডায়রিয়া আক্রান্ত শিশু ভিটামিন 'এ' সহ কোনো পুষ্টিই ধরে রাখতে পারে না বা হজম হয় না। যে সব শিশু বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ' এর অভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, তাদের প্রতি ৪ জন শিশুর ৩ জনই অন্ধ হওয়ার ৪ সপ্তাহ আগে ডায়রিয়ায় ভুগেছে।

গ. হাম : 'হাম'কে বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় ক্ষেরসা, ক্যাড়া প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে। রোগীর জ্বরের সাথে ছোট ছোট লালচে দাগ গায়ের চামড়ায় দেখা যায়। হাম এমন একটা রোগ যা ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে ভোগা শিশুদের খুব তাড়াতাড়ি অন্ধ করে দিতে পারে। সাধারণত হাম স্বাস্থ্যবান শিশুদের অন্ধত্বের কারণ হয় না। হামের কারণে জ্বর হওয়ার ফলে যকৃতে যে অল্প পরিমাণে ভিটামিন 'এ' জমা থাকতে পারে তাও বেশি তাপমাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে যায়। চোখ সুস্থ না থাকার কারণে হামের ভাইরাস সরাসরি চোখকে আক্রান্ত করে সেখানে 'ঘা' সৃষ্টি করতে পারে। যদিও 'ঘা' শুকিয়ে যেতে পারে তবু তার ক্ষতচিহ্ন চোখে থেকে যায় যাকে বলা হয় নেত্রসিত (leucoma)। এ নেত্রসিত শিশুকে অন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশে প্রতি তিন জন অন্ধশিশুর একজন অন্ধ হয় হামে আক্রান্ত হওয়ার কারণে।

ঘ. কৃমির সংক্রমণ : বাংলাদেশে প্রতি ১০জন শিশুর ৯ জন কৃমিতে আক্রান্ত হয়। অনেক শিশুই আবার সাংঘাতিকভাবে কেঁচো কৃমিতে আক্রান্ত হয়। এ সকল কৃমি পাকস্থলীতে থাকে। শিশুরা যা খায় কৃমি তা খেয়ে ফেলে এবং শিশুর খাদ্য হতে পুষ্টি গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেঁচো কৃমি শিশুর অপুষ্টির কারণ। এছাড়া ভিটামিন 'এ' দেহে ধারণ করে রাখা সম্ভব হয় না। এভাবেই অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের সৃষ্টি হয়।

৪. সামাজিক কৃষ্টিগত অভ্যাস

অনেক সামাজিক কৃষ্টিগত অভ্যাস রয়েছে যেগুলো ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে হয়। এসব অভ্যাস শিশুদের উপর ভাল ও খারাপ উভয় প্রভাবই ফেলে।

ক. ভাল অভ্যাস : মায়ের বুকের দুধে ভিটামিন 'এ' আছে। এটি একটা ভাল দিক যে, বাংলাদেশের প্রতি ১০ জন মায়ের ৯ জনই তাদের সন্তানকে দু'বৎসর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাইয়ে থাকে।

খ. খারাপ অভ্যাস : দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আমাদের দেশে কিছু কিছু খারাপ অভ্যাস রয়েছে, যেগুলো শিশুদের ভিটামিন 'এ'-এর অভাব আরো গুরুতর করে তোলে। এগুলোর একটি

হলো কলসট্রাম বা শালদুধ বা কাঁচি দুধ ফেলে দেয়া। শাল বা কাঁচি দুধে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন 'এ' আছে। মহিলারা মনে করেন যে, এ পুরনো জমানো দুধ এবং এই দুধ শিশুর জন্য ক্ষতিকারক, আসলে তা নয় এবং এ দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী। মায়েদের বিশ্বাস, শিশুদের শাক-সবজি খাওয়ানো ঠিক নয়। কেননা ওরা ছোট। বরং একটু বড় হলে শিশুদের শাক সবজি খাওয়ানোর কথা ভাবে। এ কারণেই শিশুরা পরে আর শাক-সবজি খেতে চায় না। আমাদের দেশের মায়েরা জানেন না যে, শিশুদের জন্য ভিটামিন 'এ' যুক্ত শাক-সবজি প্রয়োজন। তারা বলেন শিশুরা পছন্দ করে না। শিশুরা এজন্য পছন্দ করে না যে, তারা যখন ছোট ছিল তখন তাদের খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়নি।

চিত্র ৫০ : অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু ও তার চোখ

আরও একটা ক্ষতিকারক কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, মায়েরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে কোনো খাদ্য ও পানি খেতে দিতে চান না। শুধু তাদের বার্লি খেতে দেয়া হয়। এর ফলে শিশুর দেহে জলশূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ করে ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত কারণে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে; এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। অনেকে এখনও বিশ্বাস করে যে, সবুজ শাক সবজি যাতে অত্যধিক পরিমাণ ভিটামিন 'এ' রয়েছে তা শিশুকে খাওয়ালে ডায়রিয়া হতে পারে। তাই তারা শাক-সবজি শিশুদের খেতে দেন না।

বাংলাদেশে শিশুদের অন্ধত্বের অবস্থা

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে কতজন শিশু অন্ধ হয়ে যায় তা নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশে ২২,০০০ জন শিশুর উপর একটি জরিপ করা হয়েছিল। তাতে জানা যায়, ভিটামিন 'এ' এবং খাদ্যউপাদান আমিষের অপুষ্টিজনিত কারণে প্রতি বছর ০ থেকে ৫ বছর বয়সের ৩০ হাজার শিশু স্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে; বাংলাদেশে প্রতি ১ হাজারে ৬ জন করে শিশু অন্ধ হয় (চিত্র ৩০, ৩১)। প্রতিবছর ৬ বছর বয়সের নিচে ১ লক্ষ শিশু অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের কিছু লক্ষণ ও উপসর্গ নিয়ে ভোগে। গ্রামাঞ্চলে ০–৬ বছর বয়সের প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৩ জনেরও বেশি শিশু রাতকানা রোগে ভুগছে। শহরের বস্তি এলাকায় এ ধরনের রাতকানা রোগীর সংখ্যা আরও বেশি। গ্রামাঞ্চলে ০–৬ বছর বয়সের প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ২৫ জনের চোখে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের ক্ষত চিহ্নের দাগ পড়ে। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৪ জনের চোখে ৬ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই অপুষ্টিজনিত লক্ষণ দেখা যায়।

চিত্র ৩১ : অপুষ্টিজনিত কারণে অন্ধ চোখ

চোখে ভিটামিন 'এ' এর প্রভাব

ভিটামিন 'এ' চোখের বিভিন্ন অংশের উপঝিল্লীর সুস্থতা ও কার্যকর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে এবং "রোডোপসিন" নামক রঙ তৈরিতে সাহায্য করে। এ রোডোপসিন অল্প আলোতে দেখতে সাহায্য করে।

ভিটামিন 'এ' বিপাক ((metabolism) **এবং অন্ধত্ব রোগের প্যাথলজি** (pothogenosis of nutritional blindness)

ভিটামিন 'এ' বা রেটিনল চর্বিতে দ্রবণীয় একটি ভিটামিন। এটি প্রধানত দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যে, যকৃত, ডিম, মাছ, হেলিবাট লিভার অয়েল, কড লিভার অয়েল, মাখন, পনির প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এ ছাড়া গাঢ় সবুজ ও লাল শাকসবজি যেমন মিষ্টি কুমড়া-শাক, পুঁইশাক, পালংশাক, কলমী শাক, লাল শাক, কচু শাক, পাট শাক, মূলা শাক, সজিনা পাতা, হলুদ সবজি যেমন — মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু, গাজর, হলুদ ফলমূল যেমন পাকা আম, পাকা পেঁপে প্রভৃতিতে ভিটামিন 'এ' প্রচুর পরিমাণে থাকে (চিত্র ৩২)। এসব শাক-সবজির পূর্বগ (precursor) ক্যারোটিনেজ হতে রেটিনল মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয় এবং সেখানে থেকে কাইলোমাক্রার সাথে যুক্ত হয়ে যকৃতে রেটিনাল পালমিনেট (retinal palminate) হিসেবে জমা থাকে। যখন প্রয়োজন হয় তখন যকৃত হতে বের হয়ে রক্তের রেটিনল সংযুক্ত আমিষের সাথে মিশে এবং এ রেটিনল রক্ত থেকে সারা শরীরে উপঝিল্লী দ্বারা শোষিত হয়। এভাবে অক্ষিপটের রড ও কোনকোষসমূহও ভিটামিন 'এ' লাভ করে। বিশেষজ্ঞদের (FAO, WHO) রিপোর্ট অনুসরে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের 'এ' প্রয়োজন ১২ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজি দেহের ওজন অনুসারে। এবং শিশুদের ৬৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজি দেহের ওজন অনুসারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেশি দামী খাদ্যে ভিটামিন 'এ'-এর পরিমাণ

খাদ্যের নাম	প্রতি আউন্সে পরিমাণ (আন্তর্জাতিক একক)
হেলিবাট লিভার অয়েল	৬,০০,০০০
কডলিভার অয়েল	৩০,০০০
গরুর যকৃত	৬০০-৯০০০
পনির	৩৭৫-১৬০০
ডিমের কুসুম	২,০০০-৩০০০
বৃক্ক	২৮০
দুধ	৬০
মাখন	৩০০-১১০০

ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ কয়েকটি ফলের প্রতি আউন্সে ভিটামিন 'এ' ধারণ ক্ষমতা

ফলের নাম	'এ' প্রতি আউন্সে
১. আপেল	৪
২. কমলা	২৮
৩. কলা	৮
৪. আঙ্গুর	০
৫. লেবু	০
৬. পেঁপে	৫৬০ প্রতি ১০০গ্রামে
৭. আনারস	১৮০ মি. গ্রাম
৮. কাঁঠাল	৪৭০০ মি. গ্রাম ১০০ গ্রামে

সহজপ্রাপ্য ও স্বল্প দামী ভিটামিন 'এ'-সমৃদ্ধ খাদ্যের পুষ্টিমান

শাক-সবজির নাম	প্রতি ১০০ গ্রামের পুষ্টিমান
১. পুঁই শাক	১২,৭৫০ মি. গ্রাম
২. পালং শাক	৮,৪৭০ মি. গ্রাম
৩. কলমী শাক	১০,৭৪০ মি. গ্রাম
৪. লাল শাক	১১,৯৪০ মি. গ্রাম
৫. কচু শাক	১০,২৭৮মি. গ্রাম
৬. পাট শাক	১১, ৭০০ মি. গ্রাম
৭. গাজর	১০,৫২০ মি. গ্রাম
৮. টমেটো	৩৫১ মি. গ্রাম

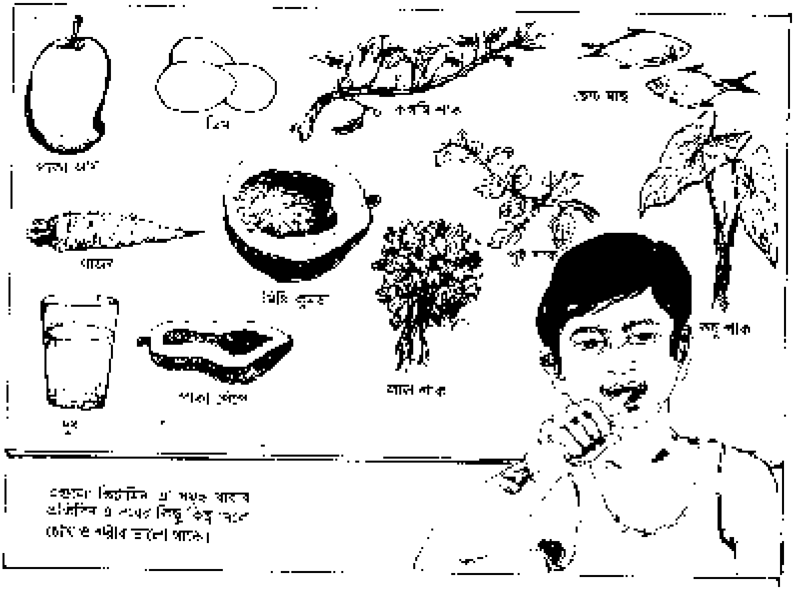

চিত্র ৩২ : ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ বিভিন্ন খাবার

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ

ক. রাতকানা : রাতকানা হলো ভিটামিন 'এ'-এর অভাবের প্রথম লক্ষণ। সুস্থ চোখ দিয়ে দিনে ভালভাবে দেখতে পারা যায়। সূর্য অস্ত যাবার পরেও সুস্থ চোখে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়; স্বল্প আলোতেও যাতে দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য চোখে ভিটামিন 'এ' প্রয়োজন শিশুর ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত কারণে দিনে সে ভালোভাবে দেখতে পায় যখন প্রচুর আলো থাকে। কিন্তু রাতে অথবা অন্ধকার ঘরে আদৌ দেখতে পায় না কেবল অনুমানে চলাফেরা করে। চোখে খাবার দেখতে পায় না বলেই সম্ভবত সে খায় না, অন্য শিশুদের সাথে মেলামেশা বা খেলাধুলা করতে পারে না। সে হাঁটাহাঁটি করতে গেলে উল্টে পড়ে যায়।

খ. নেত্রবর্ত্মের আবরণ শুষ্কতা : নেত্রবর্ত্মের নিচের কলা পুষ্ট হয়ে যায় ; নেত্রবর্ত্মের উপরিস্থিত শুকিয়ে যায়, শ্লেষ্মা গ্রন্থি নষ্ট হয়ে যায় ফলে যে শিশু ভিটামিন 'এ' অভাবে ভুগছে, তার চোখ নেত্রবর্ত্মের ও নেত্রস্বচ্ছের মধ্যে পানি থাকতে পারে না। এতে করে নেত্রবর্ত্ম

শুকিয়ে যায় যার ফলে মসৃণ এবং উজ্জ্বল থাকে না। নেত্রবর্ত্মের শুষ্কতাই শুষ্কচোখের (xeropthalmia) প্রথম চিহ্ন

গ. বিটসসের দাগ : ১৮৬৩ সালে ডাঃ বিটট শুষ্ক চোখের একটি বিশেষ চিহ্নের বিষয় উল্লেখ করেছেন। নেত্রবর্ত্ম শুষ্ক থাকে বলেই এর বিভিন্ন দিকে আবরণ তৈরি হয়। এগুলো সাবান গোলা পানির ফেনিল বুদবুদের মতো (চিত্র ৩৩)।

চিত্র ৩৩ : বিটটের দাগ

ঘ. নেত্রস্বচ্ছের শুষ্কতা : ভিটামিন 'এ' এর অভাবে নেত্রস্বচ্ছ স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে এবং এর উপরিভাগ শুকিয়ে যায়। এর ফলে নেত্রস্বচ্ছ স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। যদি একটি শিশু দীর্ঘদিন যাবৎ ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে ভোগে এবং তার চিকিৎসা না করা হয় তবে তার নেত্রস্বচ্ছ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। নেত্রস্বচ্ছ সংক্রামিত হলে মারাত্মকরূপ নেয় এবং তা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চোখ নষ্ট হয়ে রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে আগে একজন শিশু হাম বা ডায়রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে তার নেত্রস্বচ্ছ আরও তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রোগী অন্ধ হয়ে যায়।

ঙ. নেত্রস্বচ্ছের নরম ভাব : শুষ্ক নেত্রস্বচ্ছ যদি চিকিৎসা না করা হয় তবে এটি নরম হয়ে উঠে যায় এবং 'ঘা' এর সৃষ্টি হয়। যদি ঘা শুকিয়ে যায় তবে নেত্রস্বচ্ছ নেত্রাসিত হয়। আর ঘা বাড়তে থাকলে নেত্রস্বচ্ছ ছিদ্র হয়ে যায়। এ দুইভাবেই শিশুর চোখ অন্ধ হয়।

ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত রোগের চিকিৎসা

ক. অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা : স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য সহকারী গ্রামাঞ্চলে নিয়োজিত রয়েছেন। যখন কারো চোখে ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ বা চিহ্ন লক্ষ্য করেন তখনই ১ টি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দিবেন যার শক্তি ২ লক্ষ আই. ইউ. এবং নিকটস্থ চিকিৎসক বা চক্ষু বিশেষজ্ঞের নিকট তাড়াতাড়ি পাঠাবেন। যদি মা তার শিশুকে চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে না নিয়ে যেতে চান তবে দ্বিতীয় (পরের দিন) ও তৃতীয় (২-৪) সপ্তাহের মধ্যে ২ লক্ষ আই. ইউ. মাত্রার ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল নিয়মিত সেবন করতে দেবেন।

চিকিৎসার তালিকা হবে নিম্নরূপ : প্রথম দিন একটি ২ লক্ষ আই. ইউ. ভিটামিন ক্যাপসুল বা সলিউশন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন ১টি ২ লক্ষ আই. ইউ. ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বা সলিউশন দেওয়া হয়। ২ সপ্তাহ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ১ টি ২ লক্ষ আই. ইউ. ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বা সলিউশন দেওয়া হয়। শুধুমাত্র ৩টি মাত্রই (৩টি ক্যাপসুল) দিতে হয়। এর বেশি দেওয়া উচিত নয়। কারণ ভিটামিন 'এ' আধিক্যে শিশু অসুস্থ হতে পারে।

খ. ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দ্বারা অন্ধত্ব প্রতিরোধ তালিকা : অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধ চিকিৎসার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বেশি কার্যকরি ও লাভজনক। প্রতিরোধের জন্য রোগীকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ২ লক্ষ আই. ইউ. প্রতি ছয়মাসে একবার করে দিতে হয়। একটি গ্রীষ্মকাল এবং অপরটি শীতকালে। প্রতিরোধের তালিকা নিম্নরূপ :

১. ৬ মাস থেকে ৬ বৎসরের সকল শিশুকে একটি করে ২ লক্ষ আই. ইউ. অথবা সলিউশন ৬ মাস পর পর (বছরে ২ বার) দিতে হয়

২. এক বছরের বয়সের নিচের শিশুকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অর্ধেক মাত্রায় ওষুধ দিতে হবে অর্থাৎ লক্ষ আই. ইউ.। এ ক্ষেত্রে ক্যাপসুল কেটে মাত্র ৪ ফোঁটা দেওয়া হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব দূর করা সম্ভব

১. খাদ্য পুষ্টি শিক্ষা - ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধে।

২. বাড়ীর আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ।

৩. বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস

৪. বুকের দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি অন্যান্য শক্ত খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস।

৫. সম্মিলিত শিশু পরিচর্যা কার্যক্রমের সাথে ভিটামিন 'এ' প্রদান

১. খাদ্য পুষ্টি শিক্ষা : আমাদের আশেপাশের সহজলভ্য খাদ্যে ভিটামিন 'এ' প্রচুর পরিমাণ আছে—সেগুলো সম্বন্ধে জানতে পারলে সহজেই খাদ্যে ভিটামিন 'এ' এর অভাব দূর করা যেতে পারে। আমাদের আশেপাশে সবুজ ও রঙিন শাক-সবজি, ফল-মূল রয়েছে, সেগুলো মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, কলিজা প্রভৃতি হতে সস্তা, আবার এগুলো বাড়ির আঙ্গিনার জমিতেও চাষ করা যায়। এসব খাদ্যে পুষ্টিজ্ঞান মায়েদেরকে দিতে হবে। সম্ভব হলে কোন্ খাদ্য কেমন পুষ্টির মান রয়েছে তাও জানাতে হবে। আমাদের বাংলাদেশে অধিকাংশ মায়েরাই অশিক্ষিত। তাই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যকর্মীগণকে ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে মায়েদের শিক্ষাদানের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

২. বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষ : যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই দারিদ্র তাই স্বাভাবিক কারণেই ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ বেশি দামের খাদ্য যেমন মাছ, কলিজা, দুধ, ডিম, পনির, মাখন, প্রভৃতি কিনতে পারে না। ভিটামিন 'এ' যুক্ত শাক-সবজি বাড়ির আঙ্গিনার জমিতে চাষ করলে সহজে ভিটামিন 'এ'-জনিত অন্ধত্ব দূর করা সম্ভব।

৩. বুকের দুধ খাওয়ানোর অভ্যাস : যদিও বাংলাদেশের ৯০ জনের অধিক সন্তানদের বুকের দুধ খাইয়ে থাকেন তবুও তাদের কলস্ট্রাম বা শাল দুধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বা পুষ্টিগত

দৃষ্টিভঙ্গি নেই। যেহেতু এ শাল দুধে পূর্ণ মাত্রায় ভিটামিন 'এ' থাকে তা শিশুদেরকে খাওয়ানোর জন্য মায়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। যেসব আধুনিক শিক্ষিত মায়েরা বাচ্চাদের এ শাল দুধ দেন না তাদেরকেও বোঝাতে হবে।

৪. বুকের দুধের পাশাপাশি শিশুদেরকে অন্যান্য শক্ত খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস : শুধু মার দুধ খাওয়ালেই শিশুরা পূর্ণ পুষ্টি পায় না তা মায়েদেরকে বুঝাতে হবে। কারণ বাড়ন্ত শিশুদের বেশি খাবার প্রয়োজন হয়, যা বুকের দুধ দিয়ে মেটানো সম্ভব নয়। তাই মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি ৪-৬ মাস বয়স হতেই শিশুদের শক্ত খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ার জন্য মায়েদের শিক্ষা দিতে হবে। অবস্থা ভাল হলে চাউলের নরম ভাত সাথে দুধ, ডিম, কলিজা প্রভৃতি দেওয়ার পরামর্শ দিতে হবে।

চিত্র ৩৪ : খাবার স্যালাইন তৈরি ও শিশুকে খাওয়ানো

সমন্বিত শিশু পরিচর্যা কার্যক্রম

সমন্বিত শিশু পরিচর্যার (Gobi-FFF) প্রতিটি কার্যক্রম ভিটামিন 'এ'–এর অভাবজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধে সাহায্য করে। এর মধ্যখানে 'এ' যোগ করা হয়।

'G' বর্ণটি দ্বারা growth monitoring বোঝায়। এর অর্থ শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। শিশুদের অপুষ্টি রোধ করে আমরা ভিটামিন 'এ'–এর অভাব দূর করতে পারি।

সুতরাং উল্লেখ করা যায় যে, শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ শুধু অপুষ্টিই প্রতিরোধ করে না অন্ধত্বও প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

'O' বর্ণটি দ্বারা Oral rehydration therapy–কে নির্দেশ করেছে, যার অর্থ খাবার স্যালাইন, যা ডাইরিয়ার কারণে জলশূন্যতা সৃষ্টি হয়ে রোগী যে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে তা প্রতিরোধ করে।

একজন শিশু যখন সাংঘাতিক রকম জলশূন্য অবস্থায় পৌঁছে তখন সেই শিশুর অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। জলশূন্যতা রোধ করে খাবার স্যালাইন শিশুদের অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব দূর করতে সাহায্য করে (চিত্র ৩৪)।

'B' অক্ষরটি Breast feeding, বোঝায়, যার অর্থ শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো। শিশু জন্মের প্রথম কয়েক মাস বুকের দুধ থেকে ভিটামিন 'এ' পায়। শিশু যখন বাড়তে থাকে তখন তাকে ধীরে ধীরে অন্য খাবার দেওয়া হয়। বুকের দুধ শিশুর ভিটামিন 'এ'–এর অভাব ও অপুষ্টি রোধ করে এবং অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে থাকে।

'I', অক্ষরটি Immunization বোঝায়, যার অর্থ প্রতিরোধমূলক টিকাদান। ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভোগা শিশুর যদি হাম হয় তবে শিশুটি অন্ধ হয়ে যায় তাই এ টিকা অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব পরোক্ষভাবে দূর করতে সহায়তা করে।

"A' অক্ষরটি ভিটামিন 'এ'–কে বোঝায়। ভিটামিন ক্যাপসুল বিতরণ উপরোক্ত ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অন্ধত্ব প্রতিরোধে কাজ করে থাকে।

'F' অক্ষরে পরিপূরক খাদ্য প্রদান (Food supplementation) বোঝায়।

'F' অক্ষরে শিশু জন্মদানের মধ্যে প্রয়োজনীয় সময় বজায় রাখার দূরত্ব (Family Spacing) বোঝায়।

'F' অক্ষরে নারী শিক্ষা (Family education) বোঝায়।

এসবগুলোও ভিটামিন 'এ'–এর অভাব ও অন্ধত্ব প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কিত।

Obehs

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বে বাংলাদেশের কার্যক্রমের ইতিহাস ও সে সম্পর্কিত সুপারিশমালা

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর শিশুদের অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এ সমস্যা দূর করতে এগিয়ে আসে।

১৯৭২ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একজন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে আসেন এবং একটা প্রাক–জরিপ হয়। শিশুদের শুষ্ক চোখের বহু রোগী পাওয়া যায় এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে ০–৬ বৎসরের শিশুদের মুখে খাবার ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল ২ লক্ষ আন্তর্জাতিক একক বৎসরে ২ বার খাওয়ানো হয়।

বাংলাদেশ সরকার ইউনিসেফ–এর সহযোগিতায় এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরী সহায়তায় অন্ধত্ব দূরীকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। ১৯৭৩ সাল থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে—১৯৮০ সালের ইউনিসেফ (UNICEF) এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১৯৭৩ সালের শুরু করা কার্যক্রমে কি ফল হয়েছে তা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু পূর্বের ডাটা পর্যাপ্ত না থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শুধু শুষ্ক চোখের জরিপ হবে এবং হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল এ কাজের দায়িত্ব নেয়, তারা ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন। তার ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো—

গ্রাম ও শহরের বস্তি এলাকায় শুষ্ক চোখ (Xerophthalmia) এর বিভিন্ন লক্ষণ

রাতকানা	নেত্রবর্ত্মের শুষ্কতা %	বিটটস স্পট %	স্বচ্ছপটলের শুষ্কতা	স্বচ্ছপটলের ঘা	নেত্রগলিত
গ্রাম ৩.৩	২.৫	০.৯	প্রতি ১০ হাজারে ৪.৩	প্রতি ১০ হাজারে ৫.৯	প্রতি ১০ হাজারে ২৫.২
শহরের এ বস্তি এলাকা ২.৪	২.৫	১.৯	৫.৪	১৫.৯	৩৫.৪

"শুষ্ক–চোখ" ভোগা শিশুদের পিতামাতার জমির উপর জরিপ করে দেখা গেল, যে পরিবারের জমি নাই সেই পরিবারে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের সংখ্যা বেশি।

শুষ্ক-চোখ ভোগা শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার উপর জরিপ করে দেখা গেল, যারা বুকের দুধ পায় নাই তাদের অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বেশি।

সবুজ শাক–সবজি খাওয়ার উপর জরিপে দেখা গেল, ২–৩ বৎসর বয়সের শিশুদের শতকরা ৬০ জনই কোনো সবুজ শাক-সবজি খায়নি।

ডায়রিয়া বা হাম হওয়ার ফলে ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভোগা শিশুদের নেত্রশ্বেতের বিভিন্ন লক্ষণের জরিপ ইতিহাস জরিপের বহুবিধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ ও চিকিৎসার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পেশ করে :

	হাম বা ডায়রিয়া ঃ	হাম ঃ	ডায়রিয়া ঃ
নেত্রশ্বেতের শুষ্কতা	৮	১২	৮৭
নেত্রশ্বেতের ঘা	১১	৯	৫৪
নেত্রবিন্দু	৩৬	৩০	৫১
নষ্ট চোখ	১১	৫৪	৮২

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা

দু'বছর পর্যন্ত শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মাকে শিক্ষা দান এবং ৬ মাস বয়স হলেই বুকের দুধের পাশাপাশি সবুজ ও লাল শাক-সবজি, ফল-মূল প্রভৃতি খাবার দেবার শিক্ষাদান।

অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হলে দুধ দুগ্ধজাত খাদ্য দ্রব্য, মাছ, কলিজা, কডলিভার, এক্সেল, হালি বটি লিভার অয়েল প্রভৃতি খাবারের জন্য পরামর্শ দান।

২. বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, পয়ঃপ্রণালী স্বাস্থ্যসম্মতকরণ।

৩. টিকা দান কর্মসূচি বাস্তবায়নকরণ।

৪. ডায়রিয়ার জন্য মুখে খাবার স্যালাইন নিশ্চিতকরণ।

৫. সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ।

৬. খাদ্যদ্রব্য বেশি করে ফলানোর জন্য চেষ্টা করা।

৭. ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমিদান।

৮. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নকরণ।

৯. ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ বৃদ্ধিকরণ।

১০. দেশের সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল চিকিৎসার জন্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

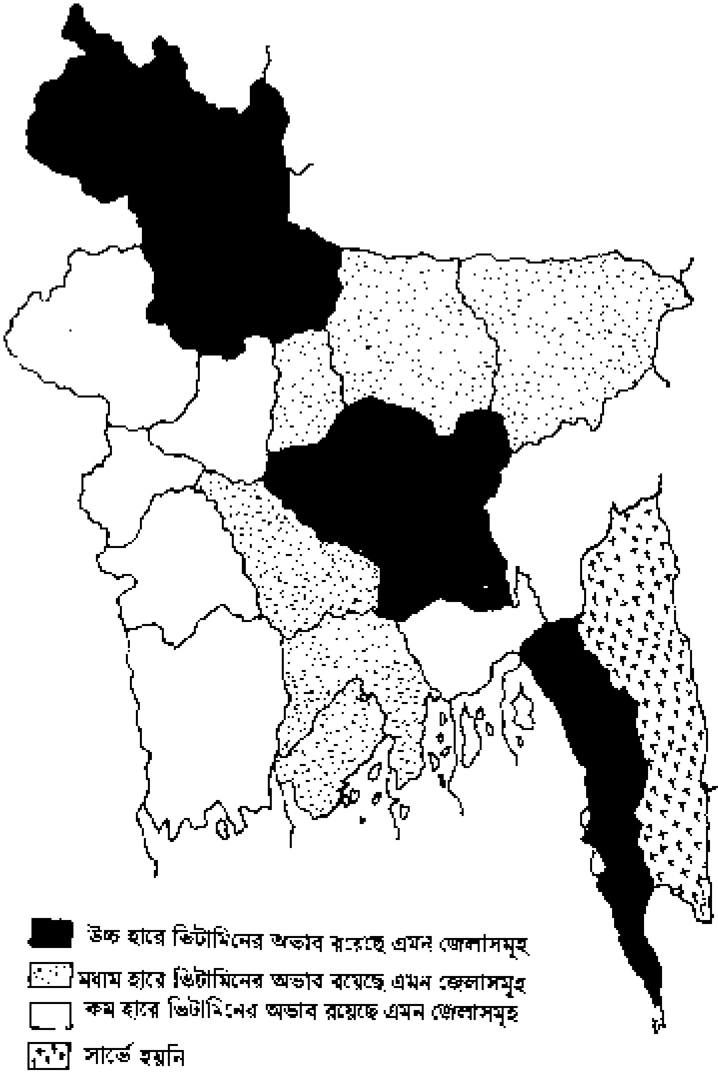

চিত্র ৩৫ : ভিটামিন 'এ' অভাব রয়েছে—এমন জেলাসমূহ

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব ও বাংলাদেশ

অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব বহুবিধ কারণে সৃষ্টি হয়। এই অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের হার ও প্রাদুর্ভাব স্থান থেকে স্থানান্তরে তারতম্য হয়। রাতকানা হার ০--১৪.৫% পর্যন্ত তারতম্য হয়। বাংলাদেশে উচ্চহারে অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের জেলাগুলো হচ্ছে—দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, জামালপুর, ঢাকা, কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম। এ ভূখণ্ড বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক হতে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বিস্তৃত। বাংলাদেশের পশ্চিম দিকের জেলাগুলো রাজশাহী, পাবনা কুষ্টিয়া, যশোহর এবং খুলনায় অপুষ্টিজনিত অন্ধত্বের হার কম (চিত্র ৩৫)।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য অন্ধত্ব ও সমাধান

মানুষের চোখ একটি অতীব মূল্যবান অঙ্গ। মানুষের কাজের সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিস্ফুটন ঘটাতে প্রয়োজন একজোড়া দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখ। এ দৃষ্টিশক্তি আমাদের কর্মের মূল চাবিকাঠি, কর্ম উৎপাদনের মূল স্তম্ভ। তাই সামাজিক উন্নতি তথা জাতির উন্নতি নির্ভর করে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান নাগরিকের উপর।

অন্ধত্ব জাতির জীবনে একটি বিরাট অভিশাপ। আর এ কথাটি আরও বেশি সত্য আমাদের বাংলাদেশের জন্য। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বারবার বিপর্যস্ত হচ্ছে। এর উপর অন্ধত্বের ফলে সৃষ্ট বিরাট জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব জাতির জন্য মরার উপর খাড়ার ঘাঁ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে -- একটি লোক অন্ধ হলে সেই অন্ধলোকটির জন্য একজন সুস্থ লোকের প্রয়োজন। তাহলে অতিসহজেই বোঝা যায় একটি লোক অন্ধ হলে আর একটি সুস্থ লোককেও তার পিছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। এরা দু'জনই প্রকারান্তরে সমাজ দেহের বোঝা স্বরূপ। এরা জাতির প্রতি বিরাট হুমকি হয়ে উঠছে। এরা জাতির অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে চলেছে

বাংলাদেশ একটি উন্নতিকামী দেশ। তাই এ দেশের জনগণকে সচেতন হতে হবে সে সমস্ত অভিশাপ থেকে যে সমস্ত অভিশাপ সমাজকে ধ্বংস করে, সমাজের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। বাংলাদেশ একটি গ্রামবহুল দেশ। ৬৮,০০০ হাজার গ্রামে বাস করে অশিক্ষিত জনসমষ্টি। এরা অশিক্ষিত ও দরিদ্র। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য অন্ধত্ব এদের বেশি। চক্ষু চিকিৎসক হিসেবে Rural Health Dispensary–তে মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব পালন কালে অর্জিত অভিজ্ঞতায় অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য মানুষ যেভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধত্বে ভোগে- তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে দেবার প্রয়োজন মনে করি। এর মাধ্যমে যদি একটি লোকও অন্ধত্ব থেকে নিষ্কৃতি পায় তাহলে প্রকারান্তরে দু'জন লোক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। ফলে তারা শ্রম দিতে পারবে, উন্নত হবে সমাজ ও দেশ।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য অন্ধত্বের প্রথম ও প্রধান কারণ হিসেবে—হঠাৎ করে বাইরের কিছু (foreign body) পড়ার বিষয় উল্লেখ করছি। গ্রামের জনগণ চোখে কিছু পড়লে তেমন কিছু মনে না করে তারা রীতিমত ঘসাঘাসি করে, সামনে যাকে পায় তাকে চোখ দেখায়---কোনো কিছু দেখা যায় কিনা। যদি দেখা যায় তখন তারা পরিধানের লুঙ্গি, শাড়ির খুঁট, গামছা, দিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ফলে তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চোখে 'ঘা' সৃষ্টি করে ফেলে। পরে তা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। ফলে অন্ধ হয়। যখন বাইরের বস্তু দেখতে পায় না তখন তারা রাতে খাবারের দু'একটি চাল চোখের ভিতরের দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। কিছু সংখ্যক রোগী বলে এতে তারা ভালও হয়ে যায়। খাবারের চাল দেয়ার ফলে কেন তারা ভাল হয় তার জবাব তাদের নিকট জানতে চেয়ে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি। তবু তারা এটিকে একটা চিকিৎসা হিসেবে ধরে নিয়েছে এবং তা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যুগ যুগ ধরে চিকিৎসা হিসেবে চলে আসছে। কিন্তু এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তারা চিন্তা করেনি কখনো। খাবারের চাল প্রয়োগের ফলে যারা রোগ মুক্ত হতে ব্যর্থ হয় তারা চোখ লাল, চোখ দিয়ে পানি পড়া, সূর্যের দিকে তাকাতে না পারা প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে গ্রাম ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়। এমনিতেই গ্রাম ডাক্তার সাহেবদের চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান থাকে কম, তার উপর চোখের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সঠিক চিকিৎসা তারা করতে পারেন না। ফলে সঠিক চিকিৎসা বিলম্বিত হয়। যখন অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যায় তখন তারা ডাক্তার সাহেবদের শরণাপন্ন হয়। তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কর্নিয়াতে 'ঘা' (corneal ulcer) হয়েছে অথবা তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে রোগ মুক্ত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। চক্ষু চিকিৎসকগণ কর্নিয়ার 'ঘা' এবং তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু কর্নিয়ায় ঘা এর পার্শ্বক্রিয়া (complication) এতই মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, সকল চিকিৎসার আয়োজনই অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

চোখের ভিতর চাল দিয়ে যে চিকিৎসা গ্রাম বাংলায় বছরের পর বছর চলে আসছে তার জবাব গ্রামবাসীর নিকট না পেয়ে এটিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। কেন কিছু রোগী আরোগ্য হয় এবং কেন বেশিরভাগ রোগী অন্ধত্বে ভোগে।

চিকিৎসার জন্য চোখের ভিতরে দেওয়া খাবারের চালটিও বাইরের বস্তু (foreign body) হিসেবে কাজ করে। ফলে অক্ষিপল্লব (eyelid) সেটিকে অপসারণ করার জন্য পাতা নাড়াচাড়া করে (blinking) বেশি। যেহেতু অক্ষিপল্লব কর্নিয়ার উপর দিয়ে উঠানামা করে চোখকে ভেজা রাখে সে সময় খাবারের চালটি কর্নিয়া ও নেত্রবর্ত্মের সাথে মৃদু ঘর্ষণ পায়। ফলে চোখের কলার মধ্যে গ্রথিত নয় (non-impacted)--এমন ছোট ছোট বিজাতীয় বস্তু (foreign body) সহজে উঠে নেত্রবর্ত্মের খিলানের নিকট থেকে যায়। তা পরে ধোয়ার ফলে চলে যায়।

এমনি করেই এ ক্ষতিকারক পদ্ধতিটি লোকের মুখে প্রচারিত হয়ে চিকিৎসার রূপ লাভ করে। এ ক্ষতিকারক পদ্ধতিটি কিভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগীর অন্ধত্ব ডেকে আনে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করছি।

খাবারের 'চাল' যখন দেওয়া হয় তখন সেটি একটি বাইরের বস্তু হিসেবে কাজ করে। খাবারের চালে ধূলিকণা, ময়লা থাকা স্বাভাবিক, এমনকি পুরানো চাল কালচার করে (culture) দেখা গেছে তাতে ছত্রাক (fungus) বিদ্যমান। যদি ঐ চাল দ্বারা কোনো স্থানে ক্ষতের (ulcer) সৃষ্টি হয় তবে সেই ছত্রাক, ক্ষতের নিকট "ছত্রাকজনিত ক্ষতের ঘা" (fungal ulcer) তৈরি করে। ছত্রাকজনিত কর্নিয়ার 'ঘা' অত্যন্ত কঠিন রোগ যা অন্ধত্ব আনয়ন করে। শুধু তাই নয় পুরানো চালের উপর গবেষণা করে প্যাথলজিস্টগণ দেখিয়েছেন যে, এ পুরানো চালে একধরনের Aflatoxin আছে যা যকৃতের সিরোসিস (cirrhosis) রোগ করে। এ তথ্যগুলো আমাদের দরিদ্র, অশিক্ষিত গ্রাম বাংলার মানুষের জানার অবকাশ নেই! কারণ তারা দুমুঠো খাবার সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত। সারাদিন রাত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা খাদ্য সংগ্রহে হিমসিম খাচ্ছে, এমন অবস্থায় চোখের যত্ন, শরীরের যত্ন তাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দেয় না। ফলে এরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তারা হাতের নিকট সহজলভ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। ফলে ফল দাঁড়ায় মারাত্মক। তাই চোখের বিজাতীয় বস্তু অপসারণে গ্রাম বাংলার মানুষের সহজতম পদ্ধতিটি "খাবারের চাল চোখে দেওয়া" চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অপ্রত্যাশিত ও মারাত্মকভাবে ক্ষতিকারক। এ ক্ষতিকারক পদ্ধতিটি শুধু প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যার (primary eye care) দ্বারা বুঝিয়ে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সহজেই দূর করা সম্ভব। এ উদ্বুদ্ধকরণের দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের—ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষক, ছাত্র শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী প্রত্যেকেই দায়িত্ব নিতে হবে। যখন সুযোগ আসে তখনই স্বাস্থ্যের ভাল-মন্দ দিকের কথা তাদেরকে বোঝানো প্রয়োজন, যাতে সীমিত সম্পদের মধ্যেও স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়। সরকারি সাহায্যের আশায় বসে না থেকে যে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করবে, এ প্রত্যাশাই জাতি কামনা করে।

চোখের সচরাচর ও প্রধান রোগ হলো 'লালচোখ' (red eye)। লাল চোখ বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কারণ হলো —

১. নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ (conjunctivitis)
২. অক্ষিপল্লবের রোগসমূহ (diseases of the eye lids)
   ক. মেবোমিয়ান গ্ল্যান্ড প্রদাহ (inflammation of meibomion gland cyst)
   খ. অঞ্জনি (stay)
৩. অচ্ছোদপটল বা নেত্রস্বচ্ছের ঘা (corneal ulcer)
৪. শ্বেতপটলের প্রদাহ (scleritis)
৫. ইউভিয়াল ট্র্যাক্টর ব্যাধি (uveal tract inflammation)
৬. চোখের উচ্চ চাপ বা গ্লুকোমা (glaucoma) প্রভৃতি।

তন্মধ্যে নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ সবচেয়ে বেশি হয়। এ নেত্রবর্ত্মের প্রদাহের চিকিৎসা গ্রাম বাংলার গরীব জনগণ কিভাবে করে থাকে তার একটা চিত্র তুলে ধরছি।

নেত্রবর্ত্মের লক্ষণসমূহ

নেত্রবর্ত্মের প্রদাহের প্রকারভেদ এবং এর স্তর হিসেবে লক্ষণসমূহের তারতম্য দেখা যায়। তবে স্থূলভাবে চোখ লাল হওয়া, চোখ দিয়ে পানি পড়া, চোখে মৃদু ব্যথা, সূর্যের দিকে তাকাতে না পারা, (phtophobia) নেত্রবর্ত্মের ঝিল্লির শোথ (chemosis), অক্ষিপল্লবের শোথ (eyo lid oedema) এবং পুঁজযুক্ত তরল পদার্থের নিঃসরণ হওয়া, শ্লেষ্মা (mucous) নিঃসরণ, রক্তাম্বুযুক্ত (seroas) রস নিঃসরণ, চোখের পাতায় পাঁপড়ি লেগে থাকা, চোখে অস্বস্তিভাব জ্বালা পোড়া, চোখে কিছু পড়লে যে অনুভূতি হয় সেই রকম অর্থাৎ চোখ খচ খচ করা প্রভৃতি।

নেত্রবর্ত্মে লক্ষণ বা উপসর্গসমূহ যা-ই হোক না কেন গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ চোখ লাল বা ব্যথা হলে চোখে যে সমস্ত পদার্থ প্রয়োগ করে তা নিম্নরূপ —

১. হুকোর পানি
২. লবণ মিশ্রিত পানি।
৩. চাল ধোওয়া পানি।
৪. ঝিনুক বা শামুকের পানি।
৫. ক্ষতিকারক বিষাক্ত গাছের রস।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে। তবু এ বিষয়ে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ফলে যদি একজন লোকও অন্ধ হয় তাহলে এ বিজ্ঞানের যুগে বাস করে আমরা তা মেনে নিতে পারি না। হুকোর পানি কিভাবে চোখের ক্ষতি করে তা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি। হুকোর পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থাকে, তাই হুকোর পানি ব্যবহারের ফলে চোখে আরও বেশি করে প্রদাহের সৃষ্টি করে। এ প্রবল প্রদাহের ফলে চোখ ভীষণ চুলকায়। রোগী তার ব্যবহৃত রুমাল বা হাত দিয়ে চোখ প্রবলভাবে ঘষতে থাকে, তার ফলে নেত্রবর্ত্মের আচ্ছাদনপটলে ঘা সৃষ্টি হয়। এই আচ্ছাদনপটল বা নেত্রস্বচ্ছ ঘা-এর চিকিৎসা না করার ফলে চোখ অন্ধ হয়। বর্তমান আমাদের দেশে ভাইরাসজনিত নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ খুবই বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে, এ ক্ষেত্রেও গ্রামবাংলার গরীব জনগণ কোনো কোনো স্থানে উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। এটিও বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ ভাইরাসজনিত নেত্রবর্ত্মের প্রদাহের যদি কোনো উপসর্গ (complication) না হয়ে থাকে তাহলে ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। যদি অন্য জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে তবে চিকিৎসকগণ ক্লোরামফেনিকল ড্রপ ও টেরামাইসিন মলম ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে চক্ষু চিকিৎসকগণ ভাইরাস নির্ণয় করে ও ভাইরাস ধ্বংসকারী ওষুধ ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

লাল চোখে অবৈজ্ঞানিক ও দূষণযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার না করে স্থানীয় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। তাহলে আশা করা যায় অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য অন্ধত্ব একেবারে হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে

চতুর্থ অধ্যায়
হঠাৎ আক্রান্ত চক্ষু রোগ ও চিকিৎসা

(১) নেত্রবর্ত্মের তীব্র পুঁজজনিত প্রদাহ (Acut purulent conjunctivitis)
(২) সদ্যজাত শিশুর নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ (Ophthalmia Neonatarum)
(৩) নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়ার 'ঘা' (Corneal ulcer)
(৪) ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত অন্ধত্ব (Xerophthalmia)
(৫) বেদনাযুক্ত লালচোখে কম দেখা।

১. নেত্রবর্ত্মের তীব্র পুঁজজনিত প্রদাহ : এজাতীয় নেত্রবর্ত্মের প্রদাহে ক্ষরণ পরিষ্কারভাবে পুঁজযুক্ত হয়ে থাকে। বয়স্কদের নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ সাধারণত *Gonococcus* জীবাণু দ্বারা হয়। এ ছাড়াও *Bacilus substilis, Streptococcus, Staphylococcus* দ্বারাও সংক্রমিত হতে পারে।

সংক্রমণের উৎস

১. যৌনাঙ্গ হতে সরাসরি সংক্রমণ
২. নেত্রবর্ত্মের ক্ষরণ, চিকিৎসক, সেবিকাদের হাতে লেগে গেলে তা থেকে চোখে সংক্রমণ।
৩. রোগীর তোয়ালে, রুমাল ও পরিধেয় বস্ত্র হতে
৪. মূত্রনালীর প্রদাহ হতে সংক্রমণ

রোগতত্ত্ব (Pathology) : এ রোগের উপ্তিকাল (incubation period) কয়েক ঘণ্টা থেকে তিনদিন পর্যন্ত হতে পারে প্রথমে *Gonococcus* নেত্রবর্ত্মের উপঝিল্লির উপর থোকা থোকা জন্মায়। এ জীবাণু সুস্থ কর্নিয়াকেও আক্রান্ত করে ছিদ্র করতে পারে। দু'তিন দিনের মধ্যে উপঝিল্লির থোকা অনেক বেড়ে যায়। ইতোমধ্যে উপরিভাগের উপঝিল্লির কোষসমূহ পচে পুঁজের আকারে ঝরে পড়ে, ফলে জীবাণু নেত্রবর্ত্মের গভীরে প্রবেশ করে। এ সময়ে নেত্রবর্ত্মের নিচের তন্তু এবং অক্ষিপল্লব ফুলে যায়। এক সপ্তাহ পরে নেত্রবর্ত্মের মূলীয় (basal) স্তর হতে উপঝিল্লির কোষসমূহ পুনরায় তৈরি হয়। এ কোষগুলি জীবাণুকে খেয়ে ফেলে। এভাবে সংক্রমণ চলে যায়। এ সময়ের মধ্যে *Gonococcus* নেত্রস্বচ্ছে ঘা সৃষ্টি করতে পারে। শেষ পর্যন্ত উপশমের পর কোনো ক্ষতচিহ্ন থাকে না।

রোগের লক্ষণসমূহ

এ রোগের লক্ষণসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা–

(ক) জীবাণু অনুপ্রবেশের সময় (stage of infiltration) : অক্ষিপল্লব খুব ফুলে যায় ফলে সেগুলোকে সহজে পৃথক করা সম্ভব হয় না। নেত্রবর্ত্মে রক্তাধিক্য ও কিমোসিস হয়। নেত্রবর্ত্মের ক্ষরণে সামান্য রক্ত ও পুঁজ থাকতে পারে। চক্ষু স্পর্শ করলে ব্যথা অনুভূত হয় এবং কর্ণের সম্মুখস্থ লসিকাগ্রন্থি বড় ও ব্যথা হতে পারে। এ ধাপ (stage) তিনদিন থাকে (চিত্র ৩৬)।

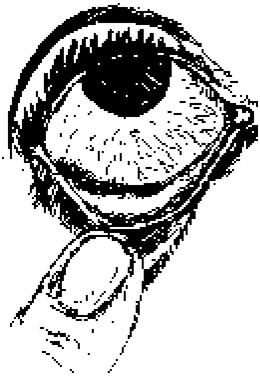

চিত্র ৩৬ : পুঁজ সৃষ্টিকারী কনজাংটিভার প্রদাহ

(খ) শ্লেষ্মাঝিল্লি হতে ক্ষরণের সময়কাল (stage of blenorrhoea) : প্রথম থেকে চিকিৎসা করা না হলে নেত্রবর্ত্মের ক্ষরণ সম্পূর্ণ পুঁজযুক্ত হয় ও অক্ষিপল্লবদ্বয়ের মাঝ দিয়ে অনবরত পড়তে থাকে। চোখের পাতা ফোলা ও ব্যথা ধীরে ধীরে কমে যায়।

(গ) ধীরে ধীরে সেরে উঠার সময়কাল (final stage of slow healing) : অক্ষিপল্লবের ফোলা কমে যায় ও ব্যথা খুবই কম হয়। নেত্রবর্ত্ম লাল ভেলভেটের মতো হয়। অক্ষিপল্লবের নেত্রবর্ত্মের প্যাপিলা তৈরি হয় এবং অক্ষিপল্লবের নেত্রবর্ত্ম লাল থাকে। ক্ষরণ ধীরে ধীরে কমে যায়। কিন্তু এই অবস্থাতেও *Gonococucs* জীবাণু পাওয়া যায়। সবশেষে রোগ নিরাময় (resolution) হয়।

রোগ নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য

১. পূর্ণবয়স্ক পুরুষ অথবা নারী
২. গনোরিয়ার ইতিহাস থাকতে পারে
৩. নেত্রবর্ত্ম ও নেত্রপল্লবের তীব্র প্রদাহ
৪. অনুলেপ (smear) পরীক্ষা করলে গ্রাম নেগেটিভ *Diplococcus* পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

(১) প্রতিরোধক (preventive)

১. রোগীর ব্যবহৃত তোয়ালে, রুমাল প্রভৃতি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. ডাক্তার ও সেবিকাগণকে রোগী পরীক্ষা করার পর উত্তমরূপে হাত পরিষ্কার করতে হবে।

(২) প্রতিষেধক (curative)

প্রথমে স্বাভাবিক লবণ পানির দ্রবণ দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে। তৎপর পেনিসিলিন ২৫০০ একক প্রতি সিসিতে দ্রবণ করে চোখে ফোঁটা দিতে হবে। প্রথমে প্রতি মিনিটে ১ ফোঁটা করে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত তারপর ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর ১ বার যতোক্ষণ পর্যন্ত ক্ষরণ বন্ধ না হয়। রাতে শোবার সময় ক্লোরামফেনিকল মলম ব্যবহার করতে হবে। যদি কর্নিয়াতে 'ঘা' হয় তবে এট্রোপিন ১% ড্রপ বা মলম ব্যবহার করতে হবে

এ রোগে নিম্নলিখিত জটিলতা হতে পারে–

(১) কর্নিয়ার জটিলতা

- ক. কর্নিয়ার উপঝিল্লির শোথ
- খ. কর্নিয়ার কিনারা বা কেন্দ্রে ঘা হতে পারে
- গ. কর্নিয়া ছিদ্র হয়ে যেতে পারে।

(২) কণীনিকা ও সিলিয়ারি বডির প্রদাহ হতে পারে

(৩) *Gonococcus* দ্বারা আক্রান্ত সন্ধিব্যথা হতে পারে।

২. সদ্যজাত শিশুর নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ

(ophthalmia neonatarum) : সদ্যপ্রসূত শিশুর দুচোখে জন্মের ২১ দিনের মধ্যে কনজাংটাইভার যে প্রদাহ বা সংক্রমণ হয় তাকে ophthalmia neonatarum বলে (চিত্র ৩৭)।

কারণ : প্রধানত *Gonococcus* দিয়ে সংক্রমণ, এ ছাড়াও *Bacterium coli, Pneumococcus, Staphylococcus, Streptococcus* প্রভৃতি জীবাণুর সাহায্যেও হতে পারে। ভাইরাস দিয়েও সংক্রমণ হতে পারে। এসব সংক্রমণ মাতার যৌনাঙ্গ থেকে আসে।

চিত্র ৩৭ : সদ্যজাত শিশুর কনজাংটিভার প্রদাহ

রোগতত্ত্ব : বড়দের মতোই শিশুদেরও রোগতত্ত্ব একই প্রকার। এতে উপঝিল্লি বা ইপিথেলিয়ামে পাপিলা বেশি করে তৈরি হয়।

BANSDOC Library Accession No.

লক্ষণ : বয়স্কদের পুঁজসৃষ্টিকারী নেত্রবর্ত্মের প্রদাহের মতোই শিশুদের একই লক্ষণ দেখা যায়। সংক্রমণের অন্তর্বর্তীকাল *Gonococcus*–এর জন্য ১–৩ দিন এবং অন্যান্য জীবাণুর জন্য ১–২ সপ্তাহ, ভাইরাসের জন্য ৭–৯ দিন। এর ক্ষরণ ৬–৮ সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় এবং খুব কমই ক্ষতত্বক্তরের চিহ্ন রয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়ের জন্য বৈশিষ্ট্য

১. নবজাতক জন্মের ২১ দিনের মধ্যে পুঁজযুক্ত দু'চোখেই প্রদাহ
২. ক্ষরণের অনুলেপ পরীক্ষা করলে Gonococcus পাওয়া যায়
৩. জীবাণু উৎপাদন পরীক্ষা ও ওষুধ নির্দেশক পরীক্ষা করলে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

(ক) প্রতিরোধক (Preventive)

১. প্রসূতির প্রসবপূর্ব যত্ন ও তার যৌনাঙ্গের সংক্রমণের যথাযথ চিকিৎসা।
২. প্রসবের পরে শিশুর চোখে সংক্রমণের চিহ্ন অনুমান করলেই সাথে সাথে ১% সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ দু'চোখে ১ ফোঁটা এবং ক্ষরণ পরিষ্কার করে চোখ খোলা রেখে ২৫০০ একক পেনিসিলিন দ্রবণ দু'চোখে দিতে হয়।

(খ) প্রতিষেধক : বয়স্কদের কনজাংটিভার পুঁজসৃষ্টিকারী প্রদাহের অনুরূপ।

জটিলতা : সময় মতো চিকিৎসা করতে না পারলে এসব রোগীদের কর্নিয়া আক্রান্ত হয়। এতে 'ঘা' হয়। এটি ছিদ্র হয়ে সংযুক্ত নেত্রসিত (adherent leucoma) সৃষ্টি হয়। কর্নিয়া পাতলা হলে সামনের দিকে বর্ধিত হয়—এতে আইরিশও লেগে থাকে। এ অবস্থাকে সামনের নেত্রস্বচ্ছের স্ফীতি বলে। অনেক সময় 'ঘা' শুকিয়ে গিয়ে অস্বচ্ছতা সৃষ্টি করে, ফলে অক্ষিপটের পীতকেন্দ্র বাড়তে পারে না, ফলে চোখে অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি হয় এবং চোখ টেরা হতে পারে।

৩. নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়ায় ঘা (Corneal ulcer) **:** কর্নিয়ায় 'ঘা' এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এতে 'ক্ষত বা ঘা' কিভাবে অন্ধত্ব করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি। মরহুম শিক্ষাগুরু অধ্যাপক আহমেদ শরীফ ও তার সহযোগীবৃন্দের নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়ার ঘা-এর উপর ১৯৮৯ সালের জরিপে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে, ছানিজনিত অন্ধত্বের কারণের পরই 'কর্নিয়ার ঘা' অন্ধত্বের প্রধান কারণ। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে 'কর্নিয়ার ঘা'কে সবচেয়ে বেশি দায়ী করেছেন। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ হওয়ায় কৃষিকাজ করার সময়ে সামান্য আঘাতের ফলে ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক দিয়ে আক্রান্ত 'কর্নিয়ার ঘা' অন্ধত্বের এক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সংক্রমিত জীবাণুগুলোর ৪৮.৩৩% ব্যাকটেরিয়া, ৩০% ছত্রাকজনিত, ৮.৩৩% ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের মিশ্রণ এবং বাকি অন্যান্য। তাঁর জরিপের মূল বিষয়গুলি টেবিল আকারে দেখানো হলো।

বিভিন্ন স্থানে হওয়া কর্নিয়ার ঘা–এর বৈশিষ্ট্য (প্রফেসর আহমেদ শরীফ ১৯৮৯ অনুসারে)

জীবাণু	স্থান			হাইপোপিয়ন	কৈশিকল্লীর ছিদ্র
	কেন্দ্রে	কেন্দ্রের চারদিকে	বাইরে		
ব্যাকটেরিয়া	৩৭,৯	৫৫,২	৬.৯	৩৭.৯	৩২.১
ছত্রাক	৭২,২	২৭,৪	--	৭২.২	৩৮.৯
মিশ্র সংক্রমণ	১০০.০	–	--	১০০,০০	২০,০
ভাইরাস	–	৫০,০	৫০.০	–	-
গড় :	৫৩,৭	৪০,৭	৫,৬	৫৩.৭	৫৯.৩

'নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত' থেকে সনাক্তকৃত বিভিন্ন ছত্রাক
(২৩টি রোগীর জরিপ)

ছত্রাকের নাম	সংখ্যা	শতকরা হার %
Fuserium solanae	৮	৩৪,৮০%
Aspergillus fumigatus	৬	২৬,০%
Candida albicans	২	৮,৭%
Alternaria alterna	১	৪,৩%
Aspergillus flavus	১	৪,৩%
Aspergillus saidoe	১	৪,৩%
Candida cruse	১	৪,৩%
Fuserium oxesporum	১	৪,৩%
Mucour Racemosys	১	৪,৩%
Penecillium Sp	১	৪,৩%

কর্নিয়ায় ক্ষত থেকে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করা হয়েছে—তা নিম্নরূপ

(৩৪ টি রোগীর জরিপ)

ব্যাকটেরিয়ার নাম	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
Staphylococcus aureus	১২	৩৫.৩%
Staphylococcus epidermids	৫	১৪.৭%
Streptococcus pneumonae	৩	৮.৮%
Streptococcus viridans	৬	১৭.৭%
Escherichia coli	৬	১৭.৭%
Klebsella pneumonnia	১	২.৯%
Pseudomonus acrodonesa	৬	১৭.৭%
Proteus mirabilis	১	২.৯%

৩৪টি রোগী থেকে ৪০টি ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করা হয়েছে

নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত সৃষ্টিকারী জীবাণু পূর্বপ্রবণ উপাদান (Predispo- Sing factors)

পূর্বপ্রবণ উপাদান	মোট রোগীর হার (%)	হার হ্যাঁ		সূচক
		ব্যাকটেরিয়া	ছত্রাক	মিশ্রণ
আঘাত	৫১.৬৭	২০.০০	২৫.০০	৬.৬৭
পোড়া	৫.০০	৫.০০		–
সারা শরীরের অসুখ (Systemic disease)	১০.০০	৮.৩৩		১.৬৭
অনাবৃত অবস্থা Exposure	৩.৩৩	৩.৩৩	–	–
জানা যায়নি এমন	৩০.০০	১১.৬৭	৫.০০	–
মোট	১০০.০০	৪৮.৩৩	৩০.০০	৮.৩৩

নেত্রস্বচ্ছে ঘা

জীবাণু সংক্রমণের ফলে নেত্রস্বচ্ছের কিছু অংশ উঠে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে তাকে 'নেত্রস্বচ্ছের ঘা' বলে (চিত্র ৩৮)। এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। এর সঠিক সময়ে সুচিকিৎসার অভাবে নানা রকম উপসর্গের সৃষ্টি হয় যার ফলশ্রুতিতে রোগী অন্ধ হয়। এতে অস্বচ্ছতা (opacity) দেখা দেয়। এ মারাত্মক ব্যাধির সাথে সাথে চিকিৎসা করা উচিত।

চিত্র ৩৮ : নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়ার ঘা

নেত্রস্বচ্ছের "ঘা"-এর শ্রেণীবিভাগ

(ক) ব্যাকটেরিয়াজনিত নেত্রস্বচ্ছে "ঘা" হচ্ছে

Pneumococcus সংক্রমণে ঘা
Streptococcus সংক্রমণে ঘা
Pseudomonus সংক্রমণে ঘা
Morax-Axenfeld সংক্রমণে ঘা প্রভৃতি।

(খ) ভাইরাসজনিত নেত্রস্বচ্ছে "ঘা" : ভাইরাসগুলো হচ্ছে—

Herpes simplex
Vericella virus
Vaccina Virus

(গ) ছত্রাকজনিত নেত্রস্বচ্ছে "ঘা" : ছত্রাকগুলো হচ্ছে—

Candida albicans
Aspergillus fumigatus.
Mucour
Nocardia.

(ঘ) অতিসংবেদনতাজনিত নেত্রস্বচ্ছে ঘা

১. নেত্রস্বচ্ছের কিনারায় ঘা (Marginal Corneal ulcer)
২. নেত্রস্বচ্ছের গোলাকার ঘা (Ring ulcer)
৩. ফিকটেনুলার নেত্রস্বচ্ছ ও নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ

(ঙ) **ভিটামিনের অভাবজনিত ঘা**
শুষ্ক চোখ বা জিরোপথ্যালমিয়া

(চ) **স্নায়ুআকর্ষী ঘা** (Neurotrophic ulcer) :
পঞ্চম স্নায়ুর আঘাতজনিত কারণে

(ছ) **নেত্রস্বচ্ছ অনাবৃত থাকার কারণে ঘা** (Exposure ulcer)

(জ) **মুরেনের ক্ষত।**

কর্নিয়ার 'ঘা'-এর কারণ

কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে যা থেকে কর্নিয়া 'ঘা' সৃষ্টি হয়। সেসব পূর্বশর্ত হচ্ছে—

(১) **কর্নিয়ার উপঝিল্লিতে আঘাত**

১. বিজাতীয় পদার্থ দিয়ে (foreign body)
২. অস্বাভাবিক দিকে অক্ষিপল্লবের পাপড়ির আঘাত
৩. নেত্রবর্ত্মের পাথুরি।

(২) **অস্বাস্থ্যকর উপঝিল্লি, যেমন—**

১. চোখের উচ্চচাপজনিত নেত্রস্বচ্ছের উপঝিল্লির শোথ (corneal epithelial oedema)
২. ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত নেত্রস্বচ্ছের নম্রতা (keratomalacia)
৩. স্নায়ু অবশের কারণে

বিজাতীয় পদার্থ জীবাণু বহন করে আনতে পারে অথবা স্থানীয় দীর্ঘস্থায়ী অশ্রুথলিকা প্রদাহ হতে সংক্রমণ হয়। এসব সংক্রমণ যখন নেত্রস্বচ্ছে বলবৎ থাকে তখন নেত্রস্বচ্ছের বা কর্নিয়ার কিছু কোষ উঠে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

কর্নিয়ার ক্ষত নিম্নলিখিত তিনভাবে শেষ হতে পারে

(১) ক্ষত বড় না হয়ে স্থানীয়ভাবে সীমিত থাকতে পারে।
(২) ক্ষত নেত্রস্বচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, পরে এর ডেসমেন্ট ঝিল্লি সামনের দিকে ফুলে যায় এবং শেষে এটি ছিদ্র হয়ে যেতে পারে।
(৩) ক্ষত সবদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এটি পচে পড়ে যায়।

রোগতত্ত্ব : সুস্থ ও স্বাভাবিক কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে একমাত্র গনকক্কাস ও ডিপথেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। কর্নিয়ায় ক্ষত সৃষ্টি হলে অন্যান্য জীবাণু যেমন

Pneumococcus ক্ষত স্থানকে বাড়িয়ে এটিকে নষ্ট করে ফেলে। কর্নিয়ার ক্ষতের রোগতত্ত্ব তিন স্তরে ভাগ করা হয়

(ক) ক্রমবৃদ্ধি স্তর (progressive stage) : এ স্তরে কর্নিয়া স্থানীয়ভাবে পচে যায় এবং পচনশীল অংশ ক্ষয় হয়ে পড়ে যায়। সাধারণত এর উপঝিল্লি ও বোমেনঝিল্লি বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপঝিল্লি পুনরায় অতি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এর পচনশীল অংশ দিয়ে ক্ষতের মেঝে তৈরি হয়। এতে ক্ষতের চারপাশের এলাকা শ্বেতকণিকা (leucocyte) দিয়ে পূর্ণ থাকে ও জলীয় পদার্থ ঢোকার ফলে ক্ষতের দেওয়াল ফুলে যায়।

(খ) প্রত্যাগমন স্তর (stage of regrssive) :পচনশীল নেত্রস্বচ্ছের প্রান্তে একটি বিভাজন রেখা (line of demarcation) তৈরি হয়। এ রেখার উপরে নেত্রস্বচ্ছ পচে পড়ে যায়, এ সময় শ্বেতকণিকাসমূহ তাদের রক্ষামূলক কাজ চালায়, পরে তারা মনোনিউক্লিয়ার কোষে পরিণত হয়। ক্রমবৃদ্ধি ও প্রত্যাগমন যখন চলতে থাকে তখন জীবাণুদুষ্ট এলাকা হতে কিছু বিষাক্ত পদার্থ কর্নিয়া ভেদ করে ভিতরে চলে যায় এবং কণীনিকাকে উত্তেজিত করে, ফলে কণীনিকাতে রক্তাধিক্য দেখা দেয়। শ্বেতকণিকা এসে কণীনিকায় জমা হয় ও রক্তবাহী নালিকা হতে বের হয়ে সম্মুখ প্রকোষ্ঠে জমা হয় এবং হাইপোপিয়ন তৈরি করে, এ হাইপোপিয়ন জীবাণুমুক্ত।

(গ) **ক্ষতান্তরের স্তর** (stage of cicatrization) : ক্ষতস্থান আঁশযুক্ত কলা দিয়ে ভরে যায় ও উপঝিল্লীর পুনর্জন্ম হয় এবং সম্পূর্ণ স্থান ঢেকে ফেলে। নতুন আঁশযুক্ত নেত্রস্বচ্ছের কিছু অংশকে অস্বচ্ছ করে ফেলে। অস্বচ্ছতার গভীরতা অনুযায়ী নেবুলা, ম্যাকুলা, লিকোমা তৈরি হয়।

ছিদ্র হয়ে যাওয়া কর্নিয়া 'ঘা'–এর রোগতত্ত্ব (Pathology of perforating corneal ulcer)

নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত বেড়ে যেতে থাকলে এটি গভীর কলাতে পৌঁছায় এবং যখন ডেসিমেন ঝিল্লিতে পৌঁছায় তখন সেটি চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ সহ্য করতে না পারায় ফুলে উঠে এটিকে ডেসমেটোসিল বলে। পরে এটি ছিদ্র হয়ে যেতে পারে। ছিদ্র হলে কিছু জলীয় রস বের হয়ে যায় এবং কণীনিকা ঐ ছিদ্রের দিকে ধেয়ে যায়। যদি ছিদ্র ছোট হয় তবে কণীনিকা ছিদ্রের গায়ে লেগে সেটি বন্ধ করে দেয়। পরে আঁশতন্তু দিয়ে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কণীনিকা সে স্থানে লেগে থাকে। এটিকে সামনের সাইনেকিয়া বলে। যদি ছিদ্র বড় হয় তবে কণীনিকার একটি অংশ সেই ছিদ্র পথে বের হয়ে যায়। এটিকে কণীনিকার ভ্রংশ (iris prolapse) বলে। খুব শীঘ্রই আইরিশের অংশের উপর এক প্রকার হলুদ বা ধূসর স্তর তৈরি হয়। কণীনিকার রক্তাধিক্যের জন্য খুব শীঘ্রই ক্ষতস্থান সেরে যায় এবং নেত্রসিত বা লিকোমার সৃষ্টি হয় (চিত্র ৪০)। এ নেত্রসিতের সাথে কণীনিকা লেগে থাকে, এটিকে সংযুক্ত নেত্রসিত (adherent leucoma) বলে।

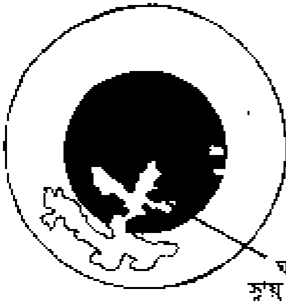

চিত্র ৩৯ : হারপিস সিমপ্লেক্স কর্নিয়ার ঘা

চিত্র ৪০ : নেত্রসিত

সামনের নেত্রস্বচ্ছের স্ফীতির রোগতত্ত্ব

যদি সংক্রমণ অধিক শক্তিশালী হয় এবং রোগীর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায় তখন সমস্ত অথবা কিছু অংশে নেত্রস্বচ্ছ পচে পড়ে যেতে পারে। এর ফলে এতে বড় ফাঁক সৃষ্টি হয়। তরলীয় রস নিষ্কাশনের ফলে কনীনিকা সামনে চলে যায় ও এটি বাইরের সংস্পর্শে আসার ফলে এতে প্রদাহ হয় এবং এক প্রকার হলুদ স্তর তৈরি হয়। শীঘ্রই এ হলুদ স্তর আঁশযুক্ত তন্তুতে পরিবর্তিত হয়ে ছদ্ম বা কৃত্রিম কর্নিয়া সৃষ্টি করে।

এ কৃত্রিম কর্নিয়া অত্যন্ত পাতলা বলে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ সহ্য করতে পারে না। ফলে এটি কনীনিকাসহ সামনের দিকে স্ফীত হয়। এটিকে সামনের নেত্রস্বচ্ছের স্ফীতি বলে।

চিত্র ৪১ : নেত্রস্বচ্ছের স্ফিতি

নেত্রস্বচ্ছ পচে উঠে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট অন্যান্য জটিলতা

(১) লেন্স স্থানচ্যুত হয় ও ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ বের হয়ে বাইরে পড়ে যায়।
(২) চোখের সমস্ত স্তরগুলোর অতি তীব্র প্রদাহ হতে পারে।
(৩) চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ হঠাৎ করে কমে যাওয়ায় রক্তবাহী নালিকা ফেটে গিয়ে এতে রক্তপাত হতে পারে (expulsive haemorrhage)
(৪) সম্মুখ প্রকোষ্ঠ না থাকার কারণে পরবর্তীতে চোখের চাপ বেড়ে যেতে পারে।

নেত্রস্বচ্ছ ছিদ্র হওয়ার কারণে সৃষ্ট জটিলতা

(১) লেন্স কণীনিকার সাথে সম্মুখ গমনের ফলে এটির অসম্পূর্ণ বিচ্যুতি হয়।
(২) লেন্স যখন ক্ষতের সংস্পর্শে আসে তখন তাতে ছানি পড়ে।
(৩) হঠাৎ করে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ কমে যাওয়ার ফলে রক্তপাত হয়।
(৪) চোখের সব অংশে মারাত্মক প্রদাহ হয়।

লক্ষণসমূহ

১. সংবেদনশীল স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ার কারণে চোখে ব্যথা হয়।
২. চোখ দিয়ে পানি পড়ে
৩. আলোভীতি দেখা দেয়
৪. মাথা ব্যথা ও চোখে কম দেখা
৫. রোগী খুব জোরের সাথে চোখের পাতা বন্ধ করে
৬. প্রতিপ্রভা (fluoresce in stain) দিয়ে পরীক্ষা করে এটি ক্ষতস্থানে রঙ ধারণ করে।
৭. ক্ষতস্থানের চারদিকে নেত্রস্বচ্ছ অস্বচ্ছ থাকে।
৮. সিলিয়ারী রক্ত পুঞ্জিভবন ও নেত্রবর্ত্মে রক্তাধিক্য হয়
৯. কণীনিকা ছাই এর রঙ ধারণ করে ও চোখের তারা ছোট হয়
১০. হাইপোপিয়ন থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে
১১. নেত্রবর্ত্ম ও নেত্রস্বচ্ছের সংযোগস্থল (limbus) হতে রক্তবাহী কৈশিকনালী ক্ষতস্থান এলাকায় আসতে পারে।

নেত্রস্বচ্ছের ক্ষতের জটিলতা

(১) চোখের সামনের প্রকোষ্ঠের কোণে তন্তুময় নিস্রাবের (fibriious exudate) ফলে পরবর্তীতে চোখের উচ্চচাপ হতে পারে।
(২) নেত্রস্বচ্ছ ছিদ্র হওয়ার ফলে এর অনেক পরিণতি দেখা দেয়
(৩) নেত্রস্বচ্ছ পচে উঠে যাওয়ার ফলে এর পরিণতিসমূহ দেখা দেয়।

চিকিৎসা

(ক) স্থানীয় চিকিৎসা

(১) সংক্রমণ বন্ধের জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে সংক্রামিত জীবাণু নির্ণয়পূর্বক এটির জন্য উপযুক্ত এন্টিবায়টিক ড্রপ ও মলম ব্যবহার করা কিন্তু এটি তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় না বলে উচ্চ পর্যায়ের এন্টিবায়টিক ড্রপ ও মলম ব্যবহার করতে হয়

(২) চোখের বিশ্রামের জন্য এট্রোপিন ১% ড্রপ ও মলম ব্যবহার করতে হয়। তীব্র আলো যাতে চক্ষুতে না পড়ে সে জন্য কালো চশমা ব্যবহার করতে হয়।

(৩) বেদনা উপশমের জন্য যে কোনো বেদনা উপশমকারী ওষুধ দিতে হয়।

(৪) কাছাকাছি কোনো সংক্রমণের স্থান থাকলে তার চিকিৎসা করতে হয়।

(খ) সাধারণ চিকিৎসা : ভিটামিন 'এ' ও 'সি' ওষুধ মুখে খাওয়াতে হয়। এ ধরনের নেত্রস্বচ্ছের ক্ষতে নিম্নলিখিত ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়—

(১) কর্টিসন বা স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ এটি সংক্রমণকে আরো বৃদ্ধি করে।

(২) কেবেন্স ফোঁটা ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৩) বেশি ক্ষরণ হলে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে 'ঘা' আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে।

নেত্রস্বচ্ছের জটিলতা চিকিৎসা

(১) পরবর্তীকালে চোখের উচ্চচাপ হলে নেত্রস্বচ্ছ ছিদ্রকরণ করতে হয়।

(২) ডেসমেটোসিল ছিদ্র হওয়ার আশংকা থাকলে ছিদ্রকরণ, প্যাড ও ব্যান্ডেজ দিতে হবে।

(৩) যদি নেত্রস্বচ্ছ ছিদ্র হয়ে কণীনিকা বের হয়ে আসে তবে যাতে আরও বের না হয় সেজন্য প্যাড ও ব্যান্ডেজ দিতে হয়।

(৪) যখন নেত্রস্বচ্ছ পচে উঠে গিয়ে কণীনিকা, লেন্স বের হওয়ার ফলে সামনের এটির স্ফীতি হয় তখন চোখ তুলে ফেলতে হয় (চিত্র ৪১)।

(ক) ব্যাকটেরিয়াজনিত নেত্রস্বচ্ছের ঘা

Pneumococcus জনিত নেত্রস্বচ্ছে ঘা : এটি *pneumococcus* দিয়ে সংক্রমিত ও সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সাধারণত এটি এক প্রকার ধূসর, বেশ বড় ক্ষতের সৃষ্টি করে। এ প্রকার ক্ষত নেত্রস্বচ্ছের প্রান্তে শুরু হলে ধীরে ধীরে নেত্রস্বচ্ছের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে বিস্তৃত হয়। এ ক্ষত এরূপ ক্রমবর্ধমান বলে এটিকে তীব্র সর্পিল ঘা (acute serpiginous ulcer) বলে।

সাধারণত হাইপোপিয়ন হয়ে থাকে। *Pneumococcus* জনিত ঘা নেত্রস্বচ্ছে আঘাত লাগার পরে হয়। এটি কয়লা শ্রমিক, কৃষকদের হয়ে থাকে। যাদের অশ্রুথলির প্রদাহ আছে তাদের এ 'ঘা' বেশি হয়।

লক্ষণ : চোখে ব্যথা, চোখ দিয়ে পানি পড়া, আলোভীতি, মাথাব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ নিয়ে রোগী আসে। আলোভীতির জন্য রোগী জোরের সাথে চোখের পাতা বন্ধ করে। রোগী কম দেখে। সিলিয়ারি রক্তপুঞ্জিভবন ও নেত্রবর্ত্মের রক্তাধিক্য হয়। গোলাকার ডিম্ব আকারের ধূসর সাদা রঙের ঘা নেত্রস্বচ্ছের মাঝখানে তৈরি হয়। কণীনিকা ছাই রঙ ধারণ করে ও চোখের তারা ছোট হয়। এ 'ঘা'–এ হাইপোপিয়ন থাকে।

চিকিৎসা : জীবাণু সনাক্ত করে এন্টিবায়োটিক দেয়া উত্তম। তবে জীবাণু সনাক্তের পূর্বেই বেশি জীবাণু–ধ্বংসী এন্টিবায়টিক ড্রপ ও মলম স্থানীয়ভাবে দেয়া উচিত।

এট্রোপিন ১ ফোঁটা দৈনিক তিন বার দেওয়া হয়। নেত্রবর্ত্মের নিচে Gentamycin ইনজেকশন দেয়া হয়।

Streptococcus জনিত ক্ষত : এ ক্ষত ক্রমবর্ধমান নয়। এটি নিউমোকক্কাসজনিত ক্ষতের মতোই। এটির লক্ষণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি একই রকম।

Pseudomonous জনিত ক্ষত : এ জীবাণু নিয়ে ক্ষত খুবই মারাত্মক কারণ মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে চোখকে বিনষ্ট করতে পারে। এ জীবাণু এক প্রকার নীলাভ সবুজ রঙ তৈরি করে। এটিই Pseudomonous জীবাণুর বৈশিষ্ট্য। এ জীবাণু ফ্লোরোসিন ও ফাইসোস্টিগমিন দ্রবণে বাস করে। এ দ্রবণ জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করা উচিত।

চিকিৎসা : Polymaxin-B-sulphate ফোঁটা প্রতি ১৫ মি: অন্তর চোখে দেয়া হয়। জীবাণুর সংক্রমণ কমে এলে মাত্রাও কম দিতে হয়। Polymaxin-Bacitracin মলম রাতে ব্যবহার করা উচিত। এ ছাড়া Gentamycin ইনজেকশন নেত্রবর্ত্মের নিচে ২০–৩০ মি. গ্রা. দেয়া হয়।

Morax-Axenfeld জনিত ক্ষত : এ প্রকার নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত সাধারণত নিষ্ক্রিয় এবং নেত্রস্বচ্ছের কেন্দ্রে হয়ে থাকে। এ ক্ষত অগভীর হয়, ছিদ্র হয় না।

চিকিৎসা : সোডিয়াম সালফাসিটামাইড ফোঁটা ও এন্টিবায়টিক মলম ব্যবহার করালে আরোগ্য লাভ করে।

***Klebsella Pheumonae* জনিত ক্ষত :** এ প্রকার ক্ষত অত্যন্ত বিরল। কোন আঘাত লাগার ফলে *klebsella pneumonae* নামক জীবাণুর সংক্রমণের ফলে এ ক্ষত হয়ে থাকে। এটি ধীরে বাড়ে ও হাইপোপিয়ন অত্যন্ত বিরল।

চিকিৎসা : Tetracycline ও Gentamycin মলম দিয়ে এর চিকিৎসা করা হয়।

(খ) ভাইরাসজনিত নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত

(খ.১) **হারপিস সিমপ্লেক্সজনিত ক্ষত :** হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস দিয়ে এ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ ব্যাধি এক চোখে হয়। যে কোনো বয়সেই হতে পারে। পূর্বপ্রবণ উপাদান হিসেবে জ্বর যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়াকে দায়ী করা হয়। এ ক্ষত সাধারণত নিম্নলিখিত প্রকারে দেখা যায়।

(১) স্নায়ুর মতো শাখা–প্রশাখা বিশিষ্ট (dendretic) ঘা (চিত্র ৩৯)
(২) গোলাকৃতি
(৩) খ্যাসাকৃতি
(৪) রেখাকৃতি
(৫) সুতাকৃতি
(৬) অগভীর বিন্দু চিহ্নিত।

লক্ষণসমূহ : রোগী চোখের ব্যথা, চক্ষু দিয়ে পানি পড়া, আলোভীতি, ঝাপসা দৃষ্টি প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে আসে। ছোট ছোট দানা নেত্রস্বচ্ছের উপঝিল্লিতে অবস্থিত স্নায়ুর প্রান্তে দেখা যায় এবং এটি শীঘ্রই ফেটে 'ঘা'-এর সৃষ্টি হয়। এ সব জায়গা ফ্লুরোসিন দ্রবণ দ্বারা রঞ্জিত হয়। দানাগুলো একত্রিত হয় এবং তারা শাখা–প্রশাখাবিশিষ্ট ক্ষত তৈরি করে। নেত্রস্বচ্ছের অনুভূতি কমে যায়। এটি তুলা দিয়ে স্পর্শ করে বোঝা যায়। সিলিয়ারি রক্ত পুঞ্জিভবন হয়, এতে হাইপোপিয়ন হতে পারে। এটি জীবাণুমুক্ত। নেত্রস্বচ্ছ সাধারণত ছিদ্র হয় না। স্টেরয়েড ব্যবহার করলে ছিদ্র হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা : এর প্রধান চিকিৎসা হচ্ছে ভাইরাস সম্বলিত উপঝিল্লিকে তুলে ফেলা, নিচের বোমেন ঝিল্লিকে অক্ষত রাখতে হবে। এজন্য তুলা জড়ান কাঠি দিয়ে ধীরে ধীরে উপরিঝিল্লিকে সরাতে হবে। হোমাট্রোপিন ২% ফোঁটা দিয়ে প্যাড ও ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। প্রতিদিন ব্যান্ডেজ বদলে দেওয়া উচিত। অনেক সময় ক্ষতস্থানের চারপাশে উপঝিল্লিকে ৫% আয়োডিন ও পটাশিয়াম আয়োডাইড ৭% মদের মধ্যে, সেটি দিয়ে পুড়ে ফেলতে হয়। এরপর ১ ফোঁটা ৪% কোকেন ও হাইড্রোক্লোরাইড দিতে হয় যা আয়োডিনকে কোষের সাথে মিশে কোকেন আয়োডেট সৃষ্টি করে। এরপরে এট্রোপিন দিয়ে প্যাড, ব্যান্ডেজ দিতে হয়। ক্ষত না শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ড্রেসিং করতে হয়।

5-Idoxouridine (5-I.U.D) প্রাথমিক ও তীব্র চিকিৎসার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। এটি ০.১ ফোঁটা হিসেবে প্রতি ঘণ্টা পর পর দিনে এবং প্রতি ২ ঘণ্টা পর পর রাতে ব্যবহার করতে হয়। এ চিকিৎসা ৭–১০ দিন করা হয়। এতেই রোগীর রোগ উপশম হতে দেখা যায়। এ সংক্রমণ একবার সেরে গেলে বারবার হতে দেখা যায়।

(খ.২) **ভেরিওলা দিয়ে নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত :** পৃথিবীর যে সব স্থানে গুটিবসন্ত হয় সেস্থানে এর প্রকোপ হয়। এ প্রকার ক্ষত বাংলাদেশে ছিল এখন এটি বিরল।

(খ.৩.) ভেকসিনা ভাইরাস দিয়ে নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত : গুটিবসন্ত টিকা প্রদানের সময় দুর্ঘটনাক্রমে এ প্রকার ক্ষত হয়। অন্যান্য জীবাণুর সংক্রমণরোধই হচ্ছে এর চিকিৎসা।

(গ) ছত্রাকজনিত নেত্রস্বচ্ছের 'ঘা'

এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে ছত্রাকজনিত নেত্রস্বচ্ছের 'ঘা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর ফলে অন্ধত্বের সংখ্যাও অসংখ্য। মরহুম ডাঃ এম, এ, ওয়াজেদ সাহেবের এক জরিপে লক্ষ্য করা যায় যে, ফসল কাটা–মাড়াই করার মৌসুমে, ধানের পাতা ও বীজ, আখ ও অন্যান্য উদ্ভিদের পাতা দিয়ে সামান্য আঘাতের ফলে সৃষ্ট নেত্রস্বচ্ছে ক্ষত সুচিকিৎসার অভাবে রোগীরা অন্ধত্বে ভোগে। এ ছত্রাকজনিত নেত্রস্বচ্ছের 'ঘা'–এর কারণ এবং কিভাবে হয় তা নিচের সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো :

কিভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়	যে পদার্থ দিয়ে আঘাত পায়		লিঙ্গ		মোট রোগীর সংখ্যা
	ধানবীজ	ধানপাতা	পুরুষ	মহিলা	
১. ধানগাছ মাড়াই কালে	৪	১৫	১৭	২	১৯
২. ধানগাছ মাড়াই শেষের সময়ে	৩	--	৩	–	৩
৩. ধান ক্ষেতে চারা রোপণের সময়		২৮	২৭	–১	[illegible]
৪. গাড়াচাড় করার সময়ে	১	৩	৫		৫
৫. মাঠে কাঁচি দিয়ে কাটার সময়	--	৪৫	৪৫	·	৪৫
মোট	৮	৯১	৯৭	৩	১০০

কারণ : ছত্রাকগুলো হচ্ছে *Fusarium, Asporgillues fumigatus, Candida albicans* ইত্যাদি প্রধান। এ ছাড়াও *Alternaria alterna, Aspergillus flavus, Aspergillous saidoc, Candida cruse, Fusarium oxyspororum, Mucour racemosus, Penicillium spacis*–এর সাহায্যেও নেত্রস্বচ্ছে ঘা হয়। বহুদিন ধরে স্টেরয়েড বা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করার ফলেও হয়ে থাকে।

লক্ষণসমূহ : চোখ লাল হওয়া, পানি পড়া, ব্যথা ও কম দেখা প্রভৃতি লক্ষণ নিয়ে রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। রোগীর কৃষিকাজ করার সময়ে বীজ, পাতা প্রভৃতি দিয়ে আঘাতের কথা জানায়। এ জাতীয় ক্ষত সাধারণত শুষ্ক, গোলাকার, হরিদ্রাভ সাদা হয়ে থাকে। এটি ধীরে ধীরে বড় হয়। কথিত 'উপগ্রহ আলসার' বা ক্ষতের চারদিকে একটি চক্রাকার 'অস্বচ্ছতা' হচ্ছে ছত্রাকজনিত 'ঘা'র নির্ণায়ক। হাইপোপিয়ন হয়ে থাকে। সিলিয়ারি

রক্ত পুষ্টিভবন হয়। ক্ষত থেকে পদার্থ নিয়ে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করলে ছত্রাক পাওয়া যায়।

ছত্রাকজনিত নেত্রস্বচ্ছের ক্ষতের চিকিৎসা : ছত্রাক প্রতিরোধী চোখের ওষুধ আমাদের দেশে এখন পাওয়া যায়। Clotrimazole 1% ড্রপ ও মলম দিতে হয়। ড্রপ ১ ফোঁটা করে ৪ বার এবং মলম পাতলা স্তরে (thin film) ৪ বার দিতে হয়। ছত্রাকের সাথে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থাকতে পারে। সেজন্য জেন্টামাইসিন ড্রপ ও নেত্রবর্ত্মের জেন্টামাইসিন ইনজেকশান দেওয়া হয়। এট্রোপিন ড্রপও দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া ব্যথা নিবারণ ওষুধ মুখে দেওয়া হয়।

(ঘ) অতিসংবেদনতাজনিত নেত্রস্বচ্ছে 'ঘা'

(১) *প্রান্তদেশের নেত্রস্বচ্ছের* ঘা : যেসব রোগীর চোখের পাতায় *Staphylo coccus* দিয়ে প্রদাহ হয় তাদের বেশি হয়ে থাকে। এটি ক্ষুদ্র গোলাকার আলসার। এক চোখে অথবা দুচোখেই হয়। ক্ষতের গায়ে কোনো জীবাণু পাওয়া যায় না। তাই একে অতিসংবেদনশীল আলসার বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও খাদ্য এলার্জি হতেও এ আলসার হতে দেখা যায়।

প্রান্তদেশের ঘা Kock week bacillus বা *Proteus vulgaris* জনিত নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ হতেও পারে।

চিকিৎসা : স্থানীয় করটিকোস্টেরয়েড ফোঁটা ব্যবহার করলে ২–৩ দিনে এটি আরোগ্য হয়। এটি পুনরায় হতে পারে।

(২) গোলাকার ক্ষত : এ ঘা প্রান্তদেশের ঘা হতে কম হয় তবে এটি বেশি ক্ষতিকর। এ গোলাকার ঘা সাধারণত একদিকে হয়, লিম্বাসের ঠিক ভিতরে প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার। এ জন্য রিং অলসার বলা হয়। এ ক্ষতে কোনো জীবাণু পাওয়া যায় না। অক্ষিপল্লব ও নেত্রবর্ত্মের প্রদাহের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এর সাথে *Bacillus* জনিত আমাশয় ও পলি আরটিরাইটিস নডোসা এ দুর্ব্যাধির সাথে যোগসূত্র থাকতে পারে।

চিকিৎসা : স্থানীয়ভাবে স্টেরয়েড ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) ফ্লিকটেনুলার নেত্রস্বচ্ছ ও নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ : এ ব্যাধি সাধারণত যক্ষ্মা আক্রান্ত শিশুদের বা শিশুকালে যক্ষ্মা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে বেশি বয়সেও হতে পারে। এটি দুচোখেই হয়। এটি সাধারণত টিউবারকুলো প্রোটিনের প্রতি অতিসংবেদনশীলতার দরুনও হতে পারে। কখনও কখনও *Staphylococcus* এর প্রতি অতিসংবেদনতার জন্যও হতে দেখা যায়। ফ্লিকটেন দানা ধূসর চক্রাকৃতি, লিম্বাসে দেখা যায় এবং পরে কর্নিয়ার প্রান্তে পৌঁছায় (চিত্র ৪২)। এটি সাধারণত এক পাশে হয়। এটি একটি অথবা একাধিক হতে পারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এটির ছোট ছোট কোষ ও রক্তবাহী নালী দেখা যায়।

চিত্র ৪২ : ফ্লিকটেন সৃষ্টিকারী কনজাংটিভার প্রদাহ

চিকিৎসা

(১) স্থানীয় : স্টেরয়েড ফোঁটা ব্যবহার করলে খুবই উপকার হয়।

(২) দেহের চিকিৎসা : যক্ষ্মা হলে যক্ষ্মার চিকিৎসা করতে হয়। মুখে করটিসোন খাওয়া উচিত নয়, এতে যক্ষ্মা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

(ঙ) স্নায়ু আকর্ষী ঘা

এ জাতীয় ক্ষত পঞ্চম কেন্দ্রীয় স্নায়ু বা ট্রাইজিমিনাল স্নায়ুর সংবেদন না থাকার কারণে হয়। ট্রাইজিমিনাল স্নায়ু নেত্রস্বচ্ছের অনুভূতি বজায় রাখে। আঘাত বা অন্য শল্য চিকিৎসার দরুন যদি এস্থানের অনুভূতি হারায় তবে এতে ঘা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ফ্লুরোসিন দিয়ে রঙ করলে নেত্রস্বচ্ছের উপত্বকের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়। পরে বড় ঘায়ের সৃষ্টি হয়। প্রায়ই নেত্রস্বচ্ছের উপরিভাগের বড় এলাকায় উপত্বক উঠে যেতে পারে। নেত্রস্বচ্ছের অনুভূতি থাকে না, তা তুলা দিয়ে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। চিকিৎসা না করলে এ ক্ষত জীবাণুদুষ্ট হয়। চক্ষুতে ব্যথা থাকে না ও চক্ষু দিয়ে পানি পড়ে এবং রোগী কম দেখে।

চিকিৎসা

চোখের দুটো পাতা সেলাই করে রাখা হয়—এটি ক্ষেত্রবিশেষে এক বছর পর্যন্ত। নেত্রবর্ত্মের ঢাকনি দিয়ে নেত্রস্বচ্ছকে ঢেকে দেওয়া যেতে পারে। বিকল্প অশ্রু দেওয়া হয়।

(চ) অনাবৃত থাকার কারণে নেত্রস্বচ্ছের ঘা (Exposure keratitis)

এ জাতীয় নেত্রস্বচ্ছের ঘা সপ্তম কেন্দ্রীয় স্নায়ু বা ফ্যাসিয়াল স্নায়ুর অসুবিধার কারণে হয়ে থাকে। এর ফলে ঘুমানোর সময়ে অক্ষিপক্ষ্ম নেত্রস্বচ্ছকে আবৃত করতে পারে না।

অক্ষিপল্লব বন্ধ করতে না পারার কারণসমূহ হচ্ছে :

১. যখন ফ্যাসিয়াল স্নায়ু অবশ হয় তখন অরবিকুলারিস মাংসপেশী অবশ হয়।

২. যখন অক্ষিগোলক সম্মুখ ভ্রংশ হয় অর্থাৎ সামনের দিকে বের হয়ে আসে।

৩. আঘাত বা অসুখের ফলে যখন অক্ষিপল্লব বহির্মুখিতা হয় বা কুঁচকে যায়।

৪. খুব কঠিন অসুখে যখন রোগী অজ্ঞান থাকে।

লক্ষণ : চোখে ব্যথা, লাল হওয়া, পানি পড়া, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ নিয়ে রোগী আসে। এ জাতীয় ঘা সাধারণত নেত্রস্বচ্ছের নিচের অংশের প্রান্তে দেখা যায় যখন রোগী ঘুমিয়ে থাকে তখন এ অংশ অনাবৃত থাকে।

চিকিৎসা : চিকিৎসা কর্নিয়ায় ঘাএর মতোই, এ ছাড়া চোখের পাতা সেলাই করা হয়। কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বিকল্প অশ্রুও দেওয়া হয়।

(ছ) মুরেনের ক্ষত

মুরেনের ক্ষত অত্যন্ত বিরল। এ জাতীয় ক্ষত নেত্রস্বচ্ছের প্রান্তে ক্ষতজনিত প্রদাহের সৃষ্টি করে। এর কারণ জানা যায় নাই।

সাধারণত বৃদ্ধদের এক চোখে হয় ও কমবয়সীদের দু'চোখেও হয়। অনেকে এটিকে নেত্রস্বচ্ছের প্রান্তের শিরাগুলোর প্রদাহের ফলে রক্তস্বল্পতাকে কারণ মনে করেন, আবার কেহ নেত্রবর্ত্ম থেকে নিঃসরিত কোলাজেন ও প্রোটিওলাইটিক্যাল এনজাইমকে দায়ী করেন।

লক্ষণ

রোগী সাধারণত ঝাপসা দৃষ্টি, প্রচণ্ড চোখ ব্যথা, আলোভীতি, চোখ দিয়ে পানি পড়া প্রভৃতি লক্ষণ নিয়ে আসে। ক্ষত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ক্ষত নেত্রস্বচ্ছের প্রান্তে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে এটির কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে।

এজাতীয় ক্ষতের অগ্রবর্তী প্রান্ত উঁচু হয়। তাতে শীঘ্রই রক্তনালীর জন্ম হয়। এ ক্ষতে কোনো জীবাণু পাওয়া যায় না এবং কখনো ছিদ্র হয় না।

চিকিৎসা

স্থানীয় : স্টেরয়েড ফোঁটা ১ ঘণ্টা পর পর দিতে হয়। ক্ষত কমে আসলে মাত্রা কমাতে হয়। ক্ষতের সমান্তরালে করে নেত্রবর্ত্ম কিছু অংশ কেটে ফেলতে হয়। ক্ষতের অগ্রবর্তী প্রান্তে ডায়াথার্মি করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৪. ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত নেত্রস্বচ্ছের ঘা (Xeropthalmia)

ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত কারণে নেত্রস্বচ্ছের এ ঘা হয়। ভিটামিন 'এ' অভাবে প্রথমে শুষ্ক চোখ হয়। এতে নেত্রবর্ত্ম ও নেত্রস্বচ্ছ আক্রান্ত হয়। পরে এতে ঘা দেখা দেয়। এ ঘা ধূসর রঙের ও কেন্দ্রে থাকে এবং দু'চোখেই হয়। কর্নিয়ার চকচকে ভাব থাকে না। সম্পূর্ণ কর্নিয়া নরম হয়ে যায়। এ ঘায়ে কোনো প্রদাহের চিহ্ন থাকে না।

চিকিৎসা : ভিটামিন 'এ' মুখে ও ইনজেকশনে দেওয়া উচিত। ভিটামিন অভাব যাতে না হয় সেজন্য খাদ্যপুষ্টি শিক্ষা দেওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য। ডায়রিয়া রোধ ও আমিষজাতীয় খাবার দেওয়া হয়।

৫. বেদনাযুক্ত লাল চোখে কম দেখলে : যে প্রধান কারণগুলো তা হচ্ছে—

১. হঠাৎ তীব্র চোখের উচ্চচাপ (acute congestive glaucoma)

২. অক্ষিকোটরের কলাসমূহের তীব্র প্রদাহ (orbital cellulitis)

৩. ক্যাভার্নাস সাইনাস বন্ধ হওয়া (caverneous sinus thrombosis)

এ সম্বন্ধে বিশদভাবে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ধীরে ধীরে আক্রান্ত চোখের অন্ধত্বের কারণ ও চিকিৎসা

১. ট্রাকোমা (Trachoma)
২. ট্রাইকিয়াসিস (Tricheasis)
৩. টেরিজিয়াম (Pteregium)
৪. ভিটামিন 'এ' অভাব ঘটিত
৫. ছানি পড়া (Cataract)

১. ট্রাকোমা (Trachoma)

এটি একটি নির্দিষ্ট সংক্রামক রোগ যা *Chulamidia trachomatis* নামক জীবাণু দিয়ে হয়ে থাকে। এটি ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যবর্তী জীবাণু। এ জীবাণু নেত্রবর্ত্মকে আক্রান্ত করে। এটি একটা দীর্ঘস্থায়ী রোগ। এ রোগে নেত্রবর্ত্মের উপঝিল্লির নিচে জীবাণু অনুপ্রবেশের ফলে ক্ষতাঙ্কুর কলা সৃষ্টি হয় যার ফলে গুটিকা বা দানা তৈরি হয়। এটি সংক্রমিত হয়ে অক্ষিপল্লবের অক্ষিপুটে ও নেত্রস্বচ্ছে পৌঁছে এবং তথায় কলাসমূহের ক্ষতাঙ্কুরের পরিবর্তন ঘটায়। সকল বয়সেই এ সংক্রমণ ঘটে থাকে তবে কম বয়সের রোগী বেশি দেখা যায়। এ রোগে নেত্রবর্ত্মে বেশ কিছু পরিমাণ ক্ষরণ হয় যা অত্যন্ত সংক্রামক। এ রোগ অত্যন্ত খারাপ জটিলতা আনে যা চক্ষুকে অন্ধ করে দেয়।

নিগ্রোদের এ রোগ খুব বেশি হয়। বাংলাদেশ ও ভারতেও এ রোগ দেখা যায়। সাধারণত গরীব বা নিম্নমধ্যবিত্তরা বেশি আক্রান্ত হয়। এ রোগ শুষ্ক ও ধূলিময় এলাকায় বেশি হয়। এ রোগের অন্তর্বর্তী কাল বা উপ্তিকক্ষ ৬-১২ দিন। রোগীর ব্যবহৃত তোয়ালে, আঙ্গুল বা মাছি মাধ্যমে এ ব্যাধি ছড়ায়।

লক্ষণ ও নিদানিক নির্দর্শন : বেশিরভাগ রোগী সাধারণত চক্ষুতে অস্বস্তিবোধ, চক্ষু চুলকানি, চক্ষু জ্বালা, চক্ষুতে বালি পড়ার মত ভাব, আলোভীতি, চক্ষু দিয়ে পানি পড়া ও সামান্য ব্যথা, লাল চোখ নিয়ে আসে। রোগী পরীক্ষা করে দেখা যায়, অক্ষিপল্লব ঝুলে নিচে আসে। খিলানের নেত্রবর্ত্ম ও অক্ষিপুটের নেত্রবর্ত্ম লাল ও মোটা হয়। এতে গুটিকা দেখা দেয় (চিত্র ১৮)। এ রোগে নেত্রস্বচ্ছে রক্তনালী জন্ম হয় যাকে Trachoma জনিত নেত্রস্বচ্ছে রক্তনালিকা বলে। নেত্রবর্ত্ম হতে রক্তনালীগুলো নেত্রস্বচ্ছের উপরের অংশের উপঝিল্লি ও বোমেন্স ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যায় এবং নেত্রস্বচ্ছের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ধাবিত হয় এবং এতে আনুভূমিক রেখায় শেষ হয়। এখানেই নেত্রস্বচ্ছে 'ঘা' হয়ে থাকে। Trachoma র সাধারণত চারটি স্তর থাকে :

১. প্রারম্ভিক স্তর (incipient stage)
২. গুটিকা তৈরির স্তর ও পিড়কা তৈরির স্তর (stage of follicle & papillae formation)
৩. ক্ষতচিহ্নের স্তর (cicatrization)
৪. জটিলতার স্তর (complication)

ট্রাকোমার জটিলতাসমূহ

১. অক্ষিপল্লবের অন্তর্মুখিতা ও এর কেশমূলের অস্বাভাবিক অবস্থান
২. অক্ষিপল্লবের বহির্মুখিতা
৩. অক্ষিগোলকের নেত্রবর্ত্ম ও অক্ষিপল্লবের নেত্রবর্ত্ম লেগে যায়
৪. নেত্রবর্ত্ম শুকিয়ে যায়
৫. নেত্রস্বচ্ছ অস্বচ্ছ হয়
৬. নেত্রস্বচ্ছের স্ফীতি হয়।

চিকিৎসা

ক) স্থানীয় : Tetracyclin মলম দৈনিক ৪ বার করে ৬ সপ্তাহ দিতে হয়

খ) মুখে : Tetracyclin ক্যাপসুল ২৫০ মিঃ গ্রাম দৈনিক ৪ বার করে ৬ সপ্তাহ অথবা যাদের tetracycline–এ অতিসংবেদনশীলতা আছে, গর্ভবতী মা ও যে মা তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে ইরাইথ্রোমাইসিন দেওয়া হয়। ইরাইথ্রোমাইসিন ট্যাবলেট ২৫০ মিঃ গ্রাম দৈনিক ৪ বার ৬ সপ্তাহ।

২. ট্রাইকিয়াসিস (Tricheasis)

যদি অক্ষিপল্লবের কেশমূল বেঁকে গিয়ে নেত্রস্বচ্ছে ঘর্ষণ দেয় তাকে ট্রাইকিয়াসিস বলে (চিত্র৪৩)

চিত্র ৪৩ : ট্রাইকিয়াসিস

কারণ

১. ট্রাকোমার চতুর্থ স্তর
২. অক্ষিপত্রের প্রদাহ
৩. পোড়া
৪. অক্ষিপল্লবের আঘাত
৫. অক্ষিপল্লবের অস্ত্রোপচার

লক্ষণ : চোখ চুলকায়, অস্বস্তিভাব, চোখে খস্ খস্ ভাব প্রভৃতি। নেত্রবর্ত্মে আঘাতের ফলে সৃষ্ট ক্ষত, ব্যথা, চক্ষু দিয়ে পানি পড়া, আলোভীতি।

চিকিৎসা

১. অক্ষিপত্রের কেশমূল বা পাপড়ি তুলে ফেলা
২. তড়িৎ বিশ্লেষ দিয়ে কেশমূলের গুটিকাকে নষ্ট করে দেওয়া
৩. ক্রাইওথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা
৪. কর্নিয়াকে রক্ষা করার জন্য কন্ট্যাক্ট লেন্স
৫. যদি বহু পাপড়ি আক্রান্ত হয় তবে অক্ষিপল্লবে প্লাস্টিক সার্জারি করতে হবে।

৩. টেরিজিয়াম বা নেত্রবর্ত্মে মাংসবৃদ্ধি (Pterygium)

এটি একটি ত্রিকোণাকৃতি নেত্রবর্ত্মের বৃদ্ধি যা প্যালপেব্রাল সমান্তরালভাবে অক্ষিগোলকের নাকের কোণ হতে শুরু হয়ে কর্নিয়াতে পৌঁছে (চিত্র ৪৪)। এটি পাশের কোণ হতেও দেখা যায় তবে কম হয়।

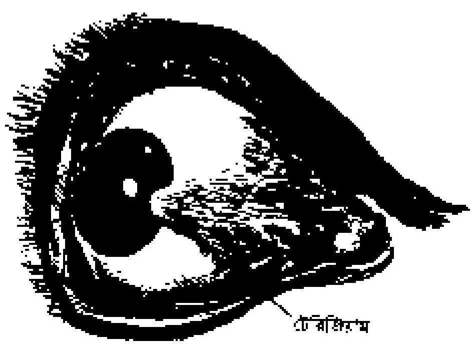

চিত্র ৪৪ : টেরিজিয়াম

কারণ : এর প্রকৃত কারণ জানা যায় নাই। এটি বয়স্ক পুরুষ লোকের হয় যারা ঘরের বাইরে রোদে কাজ করে। এর প্রধান কারণ হিসেবে নেত্রবর্ত্মের নিচে কলার অপজাত্য (degeneration) দায়ী করা হয়

লক্ষণ : এটি দু'চোখেই হয় অথবা এক চোখেই হয়। এর তিনটি অংশ মাথা, ঘাড় ও দেহ। কতকগুলো টেরিজিয়াম ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং কতকগুলো মোটেই বাড়ে না তারা স্থবির। সাধারণত যদি নেত্রস্বচ্ছ না আক্রান্ত হয় তবে কোনরূপ অসুবিধা হয় না। যদি এটি অক্ষিতারা ঢেকে ফেলে তবে রোগীর দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি চোখ নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয় তবে রোগী একটি জিনিস দুটি দেখতে পারে।

চিকিৎসা : স্থবির টেরিজিয়ামের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। যদি এটি বাড়তে থাকে তবে অস্ত্রোপচার করতে হয় (চিত্র ৪৫)।

চিত্র ৪৫ : টেরিজিয়াম অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি

৪. ভিটামিন 'এ' অভাব ঘটিত

ভিটামিন 'এ' অভাবে চোখের কতকগুলো লক্ষণ বা চিহ্নকেই আমরা xerophthalmia বলি। জেরো শব্দটির অর্থ শুষ্ক এবং অপথ্যালমিয়া অর্থ চোখ। এভাবে জিরোথ্যালমিয়া

শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় শুষ্ক চোখ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা শুষ্ক চোখকে অনেকগুলো স্তরে ভাগ করেছে।

XN	–	রাতকানা
X1A	–	নেত্রবর্ত্মের শুষ্কতা
X1B	–	বিটটের দাগ ও নেত্রবর্ত্মের শুষ্কতা
X_2	–	নেত্রস্বচ্ছের শুষ্কতা
X_3A		নেত্রস্বচ্ছের ঘা $\frac{১}{৩}$ ভাগ নেত্রস্বচ্ছ আক্রান্ত হয়
X_3B		নেত্রস্বচ্ছের ঘা $\frac{২}{৩}$ ভাগ বা তার বেশি নেত্রস্বচ্ছ আক্রান্ত হয়
Xs	–	নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত চিহ্ন বা সাদা দাগ
XF	–	শুষ্ক চোখের অধোদেশ

চোখের লক্ষণ ছাড়াও গায়ের চামড়া ব্যাঙের চামড়ার মত খসখসে হয়। শ্বাসনালীর সংক্রমণ বেশি হয়। ডাইরিয়াতে রোগী ভোগে।

চিকিৎসা : শুষ্ক চোখের চিকিৎসা জরুরী চিকিৎসার আওতায় পড়ে। সেজন্য রোগ নির্ণয় করেই তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা দেওয়া কর্তব্য। X_2 বা X_3 স্তর পর্যন্ত চিকিৎসা করে সারানো যেতে পারে। এর পরে স্তরে পৌঁছিলে ভাল হবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের দেশে অনেকেই হোমিওপ্যাথি করে থাকেন, এটিতে উপকার তো হয়ই না বরং রোগীর দুর্দশা এমনভাবে বাড়ায় যে অন্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। এমনকি রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নিম্নলিখিত চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করেছেন:

চিকিৎসা : রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথে ২ লাখ আই ইউ মুখে অথবা ১ লাখ আই ইউ ভিটামিন 'এ' মাংসে ইনজেকশন দিতে হয়

পরের দিন ২ লাখ আই, ইউ ভিটামিন 'এ' মুখে খাওয়াতে হয়। রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাবার দিন—২ লাখ আই, ইউ, মুখে খেতে দিতে হয়।

শিশুদের যাদের বয়স ১২ মাসের কম তাদের অর্ধেক মাত্রা (dose) দিতে হবে।

৫. চোখে ছানি পড়া

যে কোনো কারণে জন্মগত বা অর্জিতভাবে লেন্সে যে অস্বচ্ছতা হয় তাকে ছানি বলে।

ছানির শ্রেণীবিভাগ

ক) জন্মগত

নীল ফোঁটা ছানি (blue dot cataract).

মুকুটসদৃশ ছানি (coronary cataract).

সম্মুখভাগের লেন্স আবরণীর ছানি (ant. capsular cataract).

পশ্চাতের লেন্সের আবরণীর ছানি (post. capsular cataract).
লেন্সের সন্ধিতে ছানি (sutural cataract)
প্রবালতুল্য ছানি (coraliform cataract)
ফুলের পাপড়ি তুল্য ছানি (floriform cataract)
কেন্দ্রীয় ছানি (central cataract).
স্তরীভূত বা মণ্ডলাকার ছানি (zonular cataract)
সম্পূর্ণ ছানি (total cataract).

খ) অর্জিত ছানি

১. **বৃদ্ধবয়সের ছানি, কয়েক প্রকার ও নিম্নরূপ**
লেন্সের বহিরাংশের ছানি
লেন্সের কেন্দ্রের ছানি
লেন্সের পশ্চাৎভাগের বহিরাংশের ছানি

২. **আঘাতজনিত ছানি**
যান্ত্রিক আঘাত
রাসায়নিক আঘাত
রশ্মির আঘাত
বৈদ্যুতিক প্রবাহের আঘাত।

৩. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে**
বহুমূত্র
অতি প্যারাথায়রয়েড গ্রন্থির ক্রিয়া

৪. **চর্ম ও দৈহিক ব্যাধির কারণে**
ত্বকের প্রদাহ
মঙ্গল ইডিয়ট

৫. **চোখের রোগের জন্য ছানি** (complicated cataract).

শিশুর চোখের ছানির চিকিৎসার জন্য নিম্নলিখিত ৪টি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

১. শিশুর চোখ

১. লেন্সের অস্বচ্ছতা সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ এর উপর অস্ত্রোপচার নির্ভর করে
২. লেন্সের অবয়বতত্ত্ব উপর দৃষ্টি রেখে এর কারণও জানা যায়
৩. ছানির সাথে আরও চোখের অন্যান্য অসুখ আছে কিনা তা নির্ণয় করা হয়
৪. দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা করতে হয়।

২. **শিশুর স্বাস্থ্য :** শিশু রোগমুক্ত কি না তা দেখতে হয়। কারণ অন্যান্য দৈহিক অসুখের ফলে চোখের অসুখও হতে পারে। সেক্ষেত্রে হাম, বিপাক প্রণালীর অস্বাভাবিকতা ও জীবন রসায়নের অস্বাভাবিকতার ইতিহাস নিতে হয়।

৩. **শিশুর পিতামাতা :** শিশুর মাতার দৈহিক বা কোনো বিপাকীয় অসুখ হয়েছিল কিনা অথবা গর্ভকালীন শিশুর মাতা কোনো ওষুধ সেবন করেছিলেন কিনা অথবা গর্ভকালে হামে আক্রান্ত হয়েছিলেন কিনা। শিশুর পিতামাতাকে বোঝাতে হবে যে এ অসুখটি মারাত্মক, এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং অস্ত্রোপচারের পর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। জন্মগত ছানির অস্ত্রোপচারে কাল বিলম্ব করা উচিত নয়।

১. যখন দু'চোখের ছানিই পুরোপুরি অস্বচ্ছ। তখন জন্মের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অস্ত্রোপচার করতে হয়।

২. যখন শিশুর ছানি পুরোপুরি অস্বচ্ছ নয় তবুও কাছের দৃষ্টি খুবই খারাপ তখন অস্ত্রোপচার করতে হয়।

৩. এক চক্ষুর ছানি অত্যন্ত খারাপ যদি এটি জন্মের কয়েক দিনের মধ্যে হয়।

অস্ত্রোপচার

১. সাধারণভাবে লেন্সে তরল পদার্থ সঞ্চিত করে বের করে আনা (simple aspiration).

২. লেন্স কেটে টুকরা টুকরা করে বের করে আনা (lensectomy)।

অস্ত্রোপচারের পরবর্তী চিকিৎসা

১. দু' বছর পর্যন্ত শিশুর কনট্যাক্ট লেন্স দেওয়া যেতে পারে।

২. দু' বছর পরে চশমা দেওয়া যেতে পারে।

৩. চোখের ভিতরে কৃত্রিম লেন্স (intraocular lens) দেওয়া যেতে পারে।

ক) জন্মগত ছানি : যে ছানি শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার সময়েই থাকে তাকে জন্মগত ছানি বলে। যে ছানি জন্মের সময় ছিল না বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে হয়েছে তাকে বৃদ্ধিজনিত ছানি (developmental cataract) বলে। লেন্সের বৃদ্ধির সময়ে কোন স্তরে গণ্ডগোল বা অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে এ জাতীয় ছানি হয়। এ ধরনের লেন্সের অস্বচ্ছতার স্থানীয় কারণগুলো হলো—

প্রসূতি মাতার পুষ্টিহীনতা

জার্মান হাম নিয়ে সংক্রামিত মাতার সন্তান

অক্সিজেন অত্যল্পতা যেমন প্লাসেন্টা বা অমরায় রক্তপাত

গর্ভকালে ক্ষতিকারক ওষুধ সেবন

বারবার X-ray করা।

জন্মগত ছানি শিশুর পিতামাতাই সনাক্ত করে থাকেন। যখন কোনো শিশু আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় না বা তাকায় না তখনই সন্দেহ করতে হবে যে শিশুর দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত হচ্ছে। পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, শিশুর লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। শিশুর জন্মগত ছানি তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করা উচিত। অস্ত্রোপচার করলে শিশুর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। যদি সঠিক সময়ে অস্ত্রোপচার করা না হয় তবে টেরা চোখ, চোখের অস্বাভাবিক অনৈচ্ছিক নড়াচড়া প্রভৃতি জটিলতা দেখা যায় যা চোখকে অন্ধ করে দেয়। সে কারণে শিশুর পিতামাতার উচিত তৎক্ষণাৎ চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া

খ) অর্জিত ছানি : অর্জিত ছানির মধ্যে বার্ধক্যজনিত ছানি সবচেয়ে বেশি হয়। এ ছানি সময়মতো অস্ত্রোপচার না করলে এবং জটিলতাজনিত কারণে চক্ষু অন্ধ হতে পারে। এ জন্য আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সাধারণ আলোচনা

* বয়স সাধারণত ৫০ বৎসরের বেশি
* স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই এ ব্যাধি হয়
* দুটি চোখেই হয়, এক চোখ আগে এবং অন্যটিতে পরে হয়
* বংশগত প্রভাব থাকতে পারে।

বার্ধক্যজনিত ছানির প্রকারভেদ — তিন প্রকার :

১. **বহিরাংশের বা নরম ছানি :** (Cortical বা Cuneiform বা soft Cataract)

রোগতত্ত্ব : এতে লেন্সের বহিরাংশের তন্তু আক্রান্ত হয়। তন্তুসমূহের মাঝে পানি জমা হওয়ায় বহিরাংশ মোটা হয়ে যায়। পরে তন্তুসমূহের অভ্যন্তরে কলয়েডের পরিবর্তন হয়। আমিষ জাতীয় পদার্থসমূহে প্রথমে পরিবর্তন হয় এবং এরা জমাট বেঁধে যায়। ফলে অস্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ লেন্স অস্বচ্ছ হতে পারে।

লক্ষণ

* দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ কমে যায়
* একটি বস্তু দুই বা তিনটি দেখায়
* আলোর চারদিকে রংধনুর মতো দেখায়।

স্তরসমূহ

(১) প্রারম্ভিক স্তর : লেন্সের বাইরের দিকে রেখার মতো অস্বচ্ছতা দেখা যায়। অস্বচ্ছ রেখাগুলোর মধ্যে স্বচ্ছ লেন্স থাকে। অন্ধকার কক্ষে চোখের তারা বড় করে তাতে আলো ফেললে এ অস্বচ্ছতাগুলোকে লাল অংশোদেশের আলোর মধ্যে কালো দাগ বলে মনে হয়।

(২) **ক্রমবর্ধমান স্তর** : এ স্তরে আরো বেশি অস্বচ্ছতা জন্ম নেয়

(৩) **অপরিপক্ক স্তর** (Immature stage) : এ স্তরে অস্বচ্ছতা আরো বেড়ে যায় দৃষ্টিশক্তি খুবই কমে যায়। রোগী নিকটে আঙ্গুল গুণতে পারে। লেন্স ধূসর হয়ে যায়। কণীনিকায় ছায়া দেখা যায়। চতুর্থ পরাকিঞ্জি ছায়া দেখা যায় না। চক্ষুর অধোদেশের লাল ছায়া খুবই সামান্য দেখা যায়।

(৪) **স্ফীত স্তর** (intumescent stage) : লেন্স অপরিপক্ক থেকে প্রায়ই পরিপক্ক হয়। কিন্তু তরল পদার্থ লেন্সের মধ্যে যাওয়ার ফলে লেন্স স্ফীত বা মোটা হয়, এর ফলে সামনের প্রকোষ্ঠ অগভীর হয়ে যায়।

(৫) **পরিপক্ক স্তর** (mature stage) : লেন্সের বাইরের অংশ সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ হয়ে যায়, কণীনিকায় ছায়া দেখা যায় না, লেন্সের ফোকাস কমে যায়, অন্ধকার ঘরে পরীক্ষা করলে চোখের অধোদেশের কোনো আলো দেখা যায় না (চিত্র ৪৬)

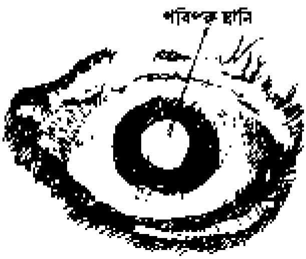

চিত্র ৪৬ : চোখের ছানি

(৬) **অতি পরিপক্ক স্তর** : (Hypermature stage): অতিপরিপক্ক স্তর দু প্রকার হতে পারে।

১. **অতিপরিপক্ক মরগ্যাগনিয়ান** : লেন্সের বাইরের অংশ সমস্ত তরলীভূত হয়ে যায়, ফলে সম্পূর্ণ লেন্স বস্তু দুধের মত সাদা পদার্থ দিয়ে পূর্ণ থলের আকার ধারণ করে। লেন্সের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস এ তরল পদার্থের নিচে পড়ে যায়। লেন্সের ক্যাপসুলে ক্যালসিয়াম জমা হতে পারে। কণীনিকায় কোনো ছায়া দেখা যায় না। চোখের সম্মুখ প্রকোষ্ঠ অগভীর বা স্বাভাবিক হতে পারে, হাত নাড়াচাড়া বুঝবার মতো দৃষ্টিশক্তি থাকে।

২. **অতিপরিপক্ক** দৃঢ় ছানি (hypermature sclerotic cataract) : লেন্সের ক্যাপসুলের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে এটির অভ্যন্তর হতে কর্টেক্স এর কিছু পদার্থ বের হয়ে যায় ফলে সম্পূর্ণ লেন্স শুভ্র হয়ে যায়। ছানির রং ঘোলাটে ধারণ করে। সম্মুখ প্রকোষ্ঠ সামান্য গভীর দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

৩. অপরিপক্ক ছানি ক্ষেত্রে

লেন্সের রং ধূসর হয়

কণীনিকায় ছায়া দেখা যায়

রোগী আঙ্গুল গুণতে পারে

চোখের তারা বড় করে পরীক্ষা করলে লাল অধোদেশ দেখা যায়।

৪. পরিপক্ক ছানির ক্ষেত্রে

লেন্সের রঙ সাদা মুক্তার মতো দেখায় (চিত্র ৪৬)

কণীনিকার ছায়া দেখা যায় না

চতুর্থ প্রতিবিম্ব ছায়া দেখা যায় না

দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। শুধু রোগী হাত নাড়াচাড়া বুঝতে পারে

অন্ধকার ঘরে পরীক্ষা করলে অধোদেশ (Fundus) দেখা যায় না।

ছানির জটিলতা (Complication of cortical Cataract):

(অ) স্ফীতস্তরে সম্মুখ প্রকোষ্ঠ অগভীর হওয়ায় তীব্র পুঞ্জিভূত উচ্চচাপ বা গ্লুকোমা হতে পারে

(আ) অতিপরিপক্ক মরগাগনিয়ান ছানি

(১) লেন্সের ক্যাপসুল বা বহিরাবরণ ফেটে করটেক্স এর বস্তুসমূহ সম্মুখ প্রকোষ্ঠে এসে পড়ায় কণীনিকায় প্রদাহ ও উচ্চচাপ হতে পারে।

(২) লেন্স স্ফীত থাকলে তীব্র পুঞ্জিভূত উচ্চচাপ হতে পারে।

(৩) সাসপেনসারি বন্ধনী নষ্ট হলে লেন্স নিচে পড়ে যেতে পারে।

(ই) অতি পরিপক্ক দৃঢ় ছানিতে লেন্স বন্ধনীর পরিবর্তনের ফলে সেটি কাচীয় রসে মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

২. কেন্দ্রের ছানি বা শক্ত ছানি : (nuclear hard cataract)

রোগতত্ত্ব : লেন্স দৃঢ় হলে এর কেন্দ্রের তন্তুসমূহে পরিবর্তন দেখা যায়। যখন এ পরিবর্তন আরও বেশি হয় তখন কেন্দ্রের ছানি শুরু হয়। লেন্সের কেন্দ্র বিক্ষিপ্তভাবে অস্বচ্ছ হয়ে যায় এবং আলো রশ্মিকে বাধা প্রদান করে। এ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে প্রায় লেন্সের ক্যাপসুল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কিন্তু একটি অত্যন্ত পাতলা কর্টেক্স এ অবস্থা হতে বাঁচতে পারে। ত্বকক্লষ্ণ (melanin) পদার্থ জমা হওয়ার দরুন লেন্স হরেরি অথবা কালো রঙের হয়ে যেতে পারে। এটিকে কালো ছানি বলে। এ প্রকার কালো ছানি কখনই অতিপরিপক্ক হয় না। এ প্রকার ছানির ক্রমবৃদ্ধি অত্যন্ত ধীরে হয়।

লক্ষণসমূহ

ক্রমাগত দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া

একটি বস্তু একাধিক দেখা

দৃষ্টিশক্তি কম হবার কারণ নিকটদৃষ্টি (myopia) হয়। অবতল লেন্স দিয়ে এ দৃষ্টিক্ষীণতা অনেকাংশে দূর করা যায়।

আলোর চারপাশে রংধনু দেখার কোনো লক্ষণ থাকে না।

নিদানিক নিদর্শন

লেন্সের রং তামাটে, পিঙ্গল বা অতি পিঙ্গল, বা কালো রং ধারণ করে।

কনীনিকার ছায়া সাধারণত বিদ্যমান থাকে।

দৃষ্টিশক্তি হাত নরাচড়া বা আঙ্গুল গোনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে

অপথ্যালমোস্কোপ দিয়ে দেখলে লেন্সের মাঝে কালো দাগ দেখা যায়।

৩. **পিছনের করটেক্স এর ছানি** (Post cortical or cupuliform cataract)

রোগতত্ত্ব : পিছনের ক্যাপসুলের ঠিক নিচেই লেন্সের করটেক্স এ অস্বচ্ছতা জন্ম হয়। প্রথমে এটি করটেক্স এর কেন্দ্র বা মাঝে জন্ম নেয় কিন্তু পরে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পিছনের কর্টেক্সে ছড়িয়ে পড়ে। ছানি অভ্যন্তরে থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্বচ্ছতা এবং তন্তুসমূহের মাঝে কোলেস্টেরল জমা হয়।

এটির অগ্রগতি অত্যন্ত ধীরে হয় এবং বছরের পর বছর একই অবস্থায় থাকতে পারে। কখনই পরিপক্ক হয় না।

লক্ষণসমূহ : এ প্রকার ছানিতে সামান্য অস্বচ্ছতাই দৃষ্টিশক্তি খুবই কমিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। কারণ এটি দৃষ্টির কেন্দ্রে পড়ে। আলোর চারপাশে কোন রং দেখা যায় না। দৃষ্টিশক্তি দিনের বেলায় কম থাকে। রোগী রাতে ভাল দেখে। এটির কারণ এই যে দিনে চোখের তারা সংকুচিত হয় এবং রাতে চোখের তারা বড় হয়।

নিদানিক নিদর্শন

চতুর্থ পারকিঞ্জি ছায়া থাকে না।

অন্ধকার কক্ষে পরীক্ষা করলে লেন্সে কালো দাগ দেখা যায়

স্লিট ল্যাম্প দিয়ে দেখলে লেন্সের পিছনের করটেক্সে অস্বচ্ছতা দেখা যায়।

ছানির চিকিৎসা

ছানির একমাত্র চিকিৎসা অস্ত্রোপচার (চিত্র ৪৭)। সেজন্য সঠিক সময়ে চিকিৎসা করা দরকার। ছানির কারণে যদি জটিলতা হয় তা চিকিৎসা করে ভাল করা অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে।

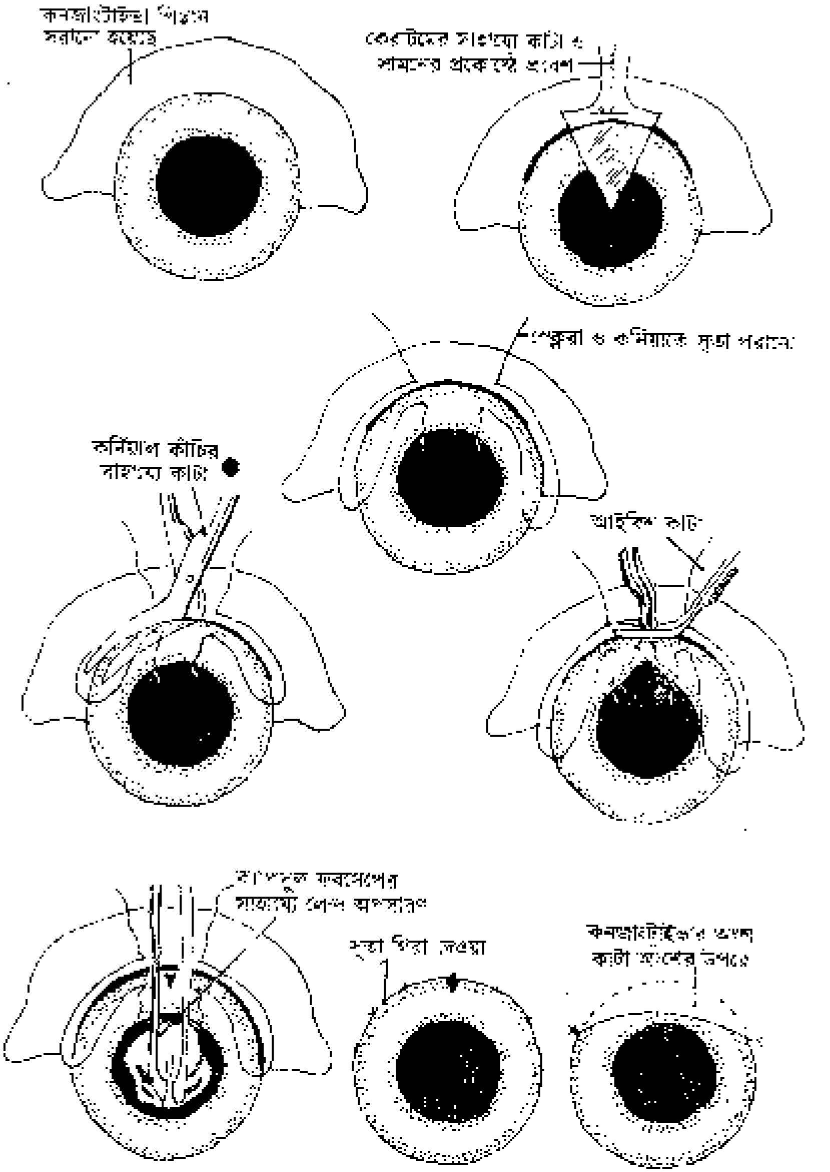

চিত্র ৪৭ : ছানি অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন পর্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

লাল চোখ

প্রতিনিয়ত আমরা অনেকেই চোখের রোগে ভুগে থাকি। এটি সচরাচর ঘটে থাকে এমন চোখের অসুখ। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে, ভালোভাবে ঘুম না হওয়া থেকে শুরু করে চোখের মারাত্মক অসুখ পর্যন্ত এর কারণ। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণত অন্ধত্ব হয় না বা ভয়ের কারণ হয় না। তবে যে সমস্ত বেদনাযুক্ত লাল চোখে দৃষ্টি ঝাপসা হয় তা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং চোখের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার আওতায় পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করতে হয়।

ক. বেদনামুক্ত লাল চোখের কারণসমূহ

(১) নেত্রবর্ত্মে রক্তক্ষরণ (sub-conjunctival haemorrhage)
(২) নেত্রবর্ত্মে মাংসবৃদ্ধি (pteregium)
(৩) নেত্রবর্ত্মে রক্তাধিক্য (hyperemia)
(৪) ওষুধের কারণে।

খ. অস্বস্তি ভাবসহ লাল চোখ

(১) নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ : ব্যাকটেরিয়াল (Bacterial), ভাইরাস (viral), এলার্জিজনিত (Allergic)
(২) ভারনাল নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ (vernal conjunctivitis)
(৩) শুষ্ক চোখ (dry eye)
(৪) বিজাতীয় পদার্থ চোখে থাকলে (foreign body)

গ. বেদনাযুক্ত লাল চোখ

(১) ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া
(২) হারপিস সিমপ্লেক্স ও জোস্টার নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহ
(৩) শ্বেতপটলের বা স্ক্লেরার প্রদাহ
(৪) নেত্রস্বচ্ছে ঘা।
(৫) কণীনিকার প্রদাহ

ঘ. বেদনাযুক্ত এবং খুবদৃষ্টিশক্তি কমে যায় তার কারণসমূহ

(১) হঠাৎ আক্রান্ত তীব্র পুঞ্জিভূত উচ্চচাপ (acute congestive glaucoma)
(২) অক্ষিকোটরের কলার প্রদাহ (orbital cellulitis)

(৩) কেভারনাস সাইনাস থ্রোমবোসিস (C. sinus thrombois)
(৪) আঘাত (trauma)

ঙ. **চোখের গৌণ অঙ্গসমূহে রোগ**
(১) অঞ্জনি (stay)
(২) ম্যাবোমিয়ান সিস্টের প্রদাহ (inflammed meibomian cyst).

চ. **অন্যান্য**
(১) এনডোক্রাইন গ্রন্থির অস্বাভাবিকতার ফলে
(২) ক্যানসার প্রভৃতি।

ক ১. নেত্রবর্ত্মের রক্তক্ষরণ : নেত্রবর্ত্মের রক্তক্ষরণের কারণগুলো হচ্ছে, আঘাত, চোখের অস্ত্রোপচার, হুপিং কফ, বহুমূত্র, উচ্চরক্তচাপ, রক্তের রোগসমূহ ও দেহের কোলাজেনাস ব্যাধিসমূহ। প্রথমে কারণ নির্ণয় করে সে অনুপাতে চিকিৎসা করতে হয় (চিত্র ৪৮)।

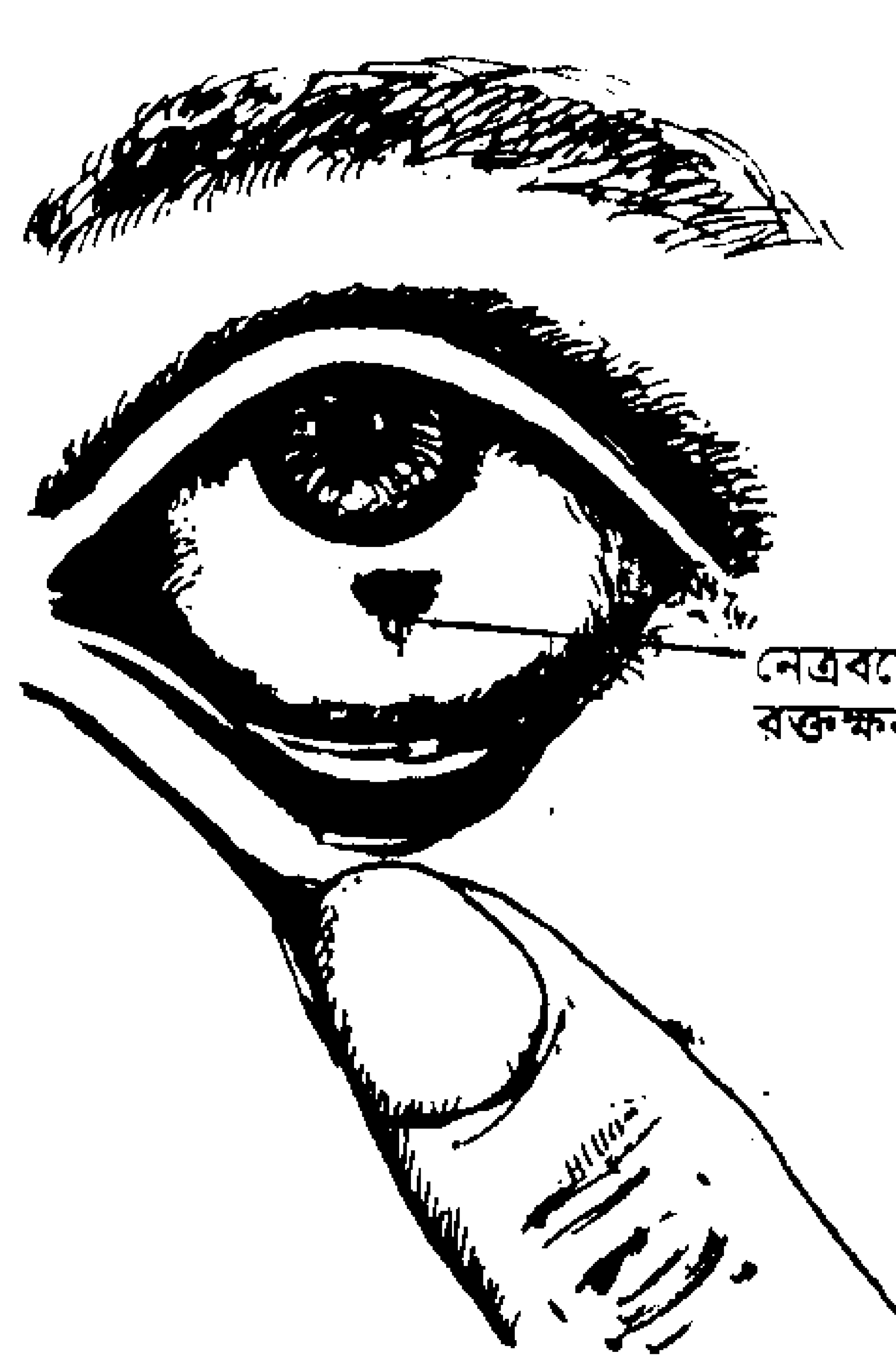

চিত্র ৪৮ : নেত্রবর্ত্মে রক্তক্ষরণ

ক ২. নেত্রবর্ত্মে মাংসবৃদ্ধি : পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক ৩. নেত্রবর্ত্মের রক্তাধিক্য : নেত্রবর্ত্মের রক্তনালীর রক্তপুঞ্জিভবন হওয়াকে নেত্রবর্ত্মে রক্তাধিক্য বলে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ বিশেষত: দূষিত বায়ুতে, দৃষ্টিশক্তির অসুবিধা, এলার্জি প্রভৃতি এর কারণ। এই কারণগুলো অপসারণই এর চিকিৎসা। তবে জিঙ্ক সালফেট $\frac{১}{২}$% এর সাথে বরিক এসিডে ১% ড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক ৪. ওষুধের কারণে : এ ওষুধগুলো হচ্ছে জেনটামাইসিন, নিওমাইসিন, এট্রোপিন ড্রপ, গ্লোকোমা প্রতিরোধী ওষুধ। ওষুধে ব্যবহৃত Preservative, ও মদ খেলে চোখ লাল হয়।

খ ১. নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ : পূঁজজনিত নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ভাইরাসজনিত নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ ফলিকুলার কনজাংটিভাইটিস্ তৈরি করে এতে স্থানীয় লসিকা গ্রন্থি (lymphgland) ফুলে যায়। চোখ লাল হয় ও অত্যধিক পানি পড়ে।

এলার্জিজনিত নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ সাধারণত তৃণ–জ্বরে (hayfever) হয়ে থাকে। অতিক্ষুদ্র তৃণ দানা, সবজি ও জীবজন্তুর ময়লার টুকরা এ প্রদাহ সৃষ্টি করে। অনেক ওষুধও এটি করে থাকে। খাদ্য এলার্জিকেও অনেকে দায়ী করেন। চোখ লাল হয়, চুলকায়, রোগী হাত দিয়ে চোখ ঘষতে থাকে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এর উপযুক্ত চিকিৎসা হল এলার্জিজনিত পদার্থকে সরে ফেলা। এ ছাড়াও স্টেরয়েড দেওয়া যেতে পারে।

খ ২. ভারনাল নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ (vernal conjunctivitis) : এ প্রদাহ সাধারণত গরমকালে দেখা যায় এবং শীতকালে সেরে যায়। ৬–২০ বৎসরের বালকদেরই বেশি দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে ধূলি ও ময়লা কণার উপর শুষ্ক তাপকে দায়ী করা হয়। চোখ খুব চুলকায়, জ্বালা করে, আলোভীতি হয় ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এতে উপরের অক্ষিপল্লবের নেত্রবর্ত্মে "Cobblestone" এর মত প্যাপিলা দেখা যায়। সাদা সুতোর মতো নেত্রবর্ত্মের ক্ষরণ হয় (চিত্র ৪৯) । Sodium chromoglycate ২% ড্রপ দৈনিক ৪ বার দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এ ছাড়াও স্টেরয়েড ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিত্র ৪৯ : অক্ষিপল্লবের ভারনাল কনজাংটিভাইটিস

খ ৩. শুষ্ক চোখ : সমস্ত ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি অপসারণ করলেও চোখ শুষ্ক হবে না। কারণ Acessory lacrimal gland of krause and wolfering এবং নেত্রবর্ত্মের মিউকাস গ্রন্থি চোখকে ভেজা রাখে।

কারণ—

১. ভিটামিন 'এ' স্বল্পতা

২. ট্রামোকার ৪র্থ স্তরে

৩. Keratoconjunctivitis Sicca (K.C.S.)

লক্ষণসমূহ : চোখ জ্বালা, বালি বালি ভাব, আঁঠালো সুতার মতো মিউকাস ক্ষরণ প্রভৃতি উপসর্গ নিয়ে রোগী আসে। অনেকে রোদে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বেশিক্ষণ ধরে পড়ার জন্য সেই উপসর্গগুলো আরও বেশি হয় বলে চিকিৎসকগণকে জানান। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, এ সমস্ত রোগীদের শোকে বা পেঁয়াজ কাটলেও চোখ দিয়ে পানি পড়ে না। এ লক্ষণ দেখা দিলে বুঝতে হবে যে রোগীর 'শুষ্ক চোখ' রোগ হয়েছে।

চিকিৎসা

১. রোগীকে বাইরে যাবার সময় চশমা পড়তে হয়।

২. কৃত্রিম অশ্রুর (artificial tear) ড্রপ দিতে হয় ও মলম ব্যবহার করা যায়।

৩. ক্ষেত্র বিশেষে চোখের পাতা সেলাই করা যেতে পারে।

৪. Electrocautery এবং argon laser দিয়ে নেত্রবিন্দু বন্ধ (punctalocclusion) ও canaliculoplesty করা যেতে পারে।

খ ৪. বিজাতীয় পদার্থ চোখে পড়লে (F. B. in The Eye).

অষ্টম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।

গ.১. ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া : gentamycin, neomycin, sulphur drug, Atropine প্রভৃতি ওষুধে যে সব রোগীদের অতিসংবেদনতা আছে তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এরূপ হলে সাথে সাথে ওষুধ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা উচিত।

গ.২. হারপিস সিমপ্লেক্স নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহ : এ জাতীয় নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহ সাধারণত কম বয়সীদের হয়ে থাকে। এতে নেত্রস্বচ্ছের উপরিভাগে বিন্দুবৎ প্রদাহের সৃষ্টি হয় পরে এতে ঘা দেখা দেয়। এটাকে dendritic ulcer বলে। এতে নেত্রস্বচ্ছের অনুভূতি কমে যায়, তা তুলা দিয়ে পরীক্ষা করলে বোঝা যায়।

চিকিৎসা

আক্রান্ত নেত্রস্বচ্ছের উপঝিল্লি অপসারণ করতে হয়। আই. ইউ. ডি ড্রপ ও মলম দেওয়া হয়। স্টেরয়েড ব্যবহার না করাই উত্তম। এ অসুখ বার বার হতে দেখা যায়। অনেক সময়ে কর্নিয়া সংযোজন করতে হয়।

হারপিস জোস্টার নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহ : এ জাতীয় নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহে পঞ্চম কেন্দ্রীয় স্নায়ু বা ট্রাইজিসিনাল স্নায়ু শাখায় ফুসকুরি দেখা যায়। এতে মুখমণ্ডলে প্রচণ্ড ব্যথাসহ

ফুসকুরি উঠে, পরে তা ফেটে যায়। কর্নিয়াতেও ফুসকুরি উঠে ফেটে গিয়ে ঘা হতে পারে। এতে কর্নিয়ার অনুভূতি একেবারে কমে যায়।

চিকিৎসা

এ রোগের প্রথমে এসাইক্লোভির (zovix) বড়ি মুখে ৮০০ মি: গ্রাম করে দৈনিক পাঁচ বার ৭ দিন দিলে খুব ভাল উপকার পাওয়া যায়। এতে ফুসকুরি বাড়তে পারে না। এতে চামড়ার এন্টিবায়টিক ও স্টেরয়েড মিশ্রিত মলম দেওয়া হয়। যদি প্রচণ্ড ব্যথা হয় (post-herpetic neuralgia) তবে মুখে স্টেরয়েড বড়ি খাওয়াতে হয়। কণীনিকা প্রদাহ (iritis) স্টেরয়েড ড্রপ দিতে হয়। সাথে এট্রোপিন ড্রপ বা মলম দেওয়া হয়ে থাকে।

গ.৩. শ্বেতপটলের প্রদাহ (Scleritis) : শ্বেতপটলের প্রদাহ দু'চোখেই হয় এবং মেয়েদের বেশি দেখা যায়।

কারণ—

১. টক্সিক ও এলার্জিক রোগের প্রভাবে (toxic allergic influences)
২. দৈহিক ও বিপাকীয় রোগের কারণে (systemic & metabolic diseases).

লক্ষণ : চোখ লাল ও ব্যথা হয়। সিলিয়ারি বডিতে টিপ দিলে ব্যথা অনুভব হয়। শ্বেত পটলের উপরে কালো নীল দাগ পড়ে কণীনিকার ও নেত্রস্বচ্ছের প্রদাহ হতে পারে। অনেক সময় চোখের উচ্চচাপ হয়ে দৃষ্টিখর্বতা হয়। শ্বেতপটল পাতলা হয়ে স্ফীত হয় (staphyloma)। এ রোগের মারাত্মক রূপকে ব্রাউনি স্ক্লেরাটিস (brawny scleritis) বলে। এতে সম্পূর্ণ চক্ষু লাল হয়। সামনের শ্বেতপটল সম্পূর্ণ ফুলে যায়। এটি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে এবং চোখের ভিতরে মারাত্মক প্রদাহের সৃষ্টি করে। শেষে চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

চিকিৎসা : কারণ নির্ণয়পূর্বক চিকিৎসা করতে হয়। স্থানীয় স্টেরয়েড ফোঁটা ব্যবহার করলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। মুখে আইব্রুপ্রোফেন বড়ি (non-steroidal anti infammatory drug) খাওয়াতে হয়। চোখের উচ্চচাপ দেখা দেওয়া মাত্র উচ্চচাপ বিরোধী ওষধ দিতে হয়।

গ.৪. নেত্রস্বচ্ছের ঘা : তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ.৫. কণীনিকার প্রদাহ

কারণ

(১) বাইরে থেকে সংক্রমণ : ছিদ্র হয়ে আঘাত।

(২) স্থানীয় কারণ--

১. আঘাত
২. নেত্রস্বচ্ছের ক্ষত
৩. শ্বেতপটলের প্রদাহ

৪. হারপিস জীবাণু দিয়ে সংক্রমণ।
৫. চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ টিউমার
৬. অক্ষিকোটরের কোষের প্রদাহ।

(৩) অনির্দিষ্ট কারণ

১. জীবাণুদুষ্ট স্থান হতে ব্যাকটেরিয়াল এলার্জি
২. যক্ষ্মার জীবাণু হতে এলার্জি
৩. সিফিলিসজনিত এলার্জি।

(৪) নির্দিষ্ট কারণ : যক্ষ্মা, সিফিলিস, গনোরিয়া, ভাইরাস সংক্রমণ ও প্রটোজোয়াল সংক্রমণ।

(৫) দৈহিক ব্যাধির কারণে

স্টিলের ব্যাধি, হাড় ও জোড়া ব্যথা, বাত, বহুমূত্র ও সেপটিসিমিয়ার দূষ্টির কারণ।

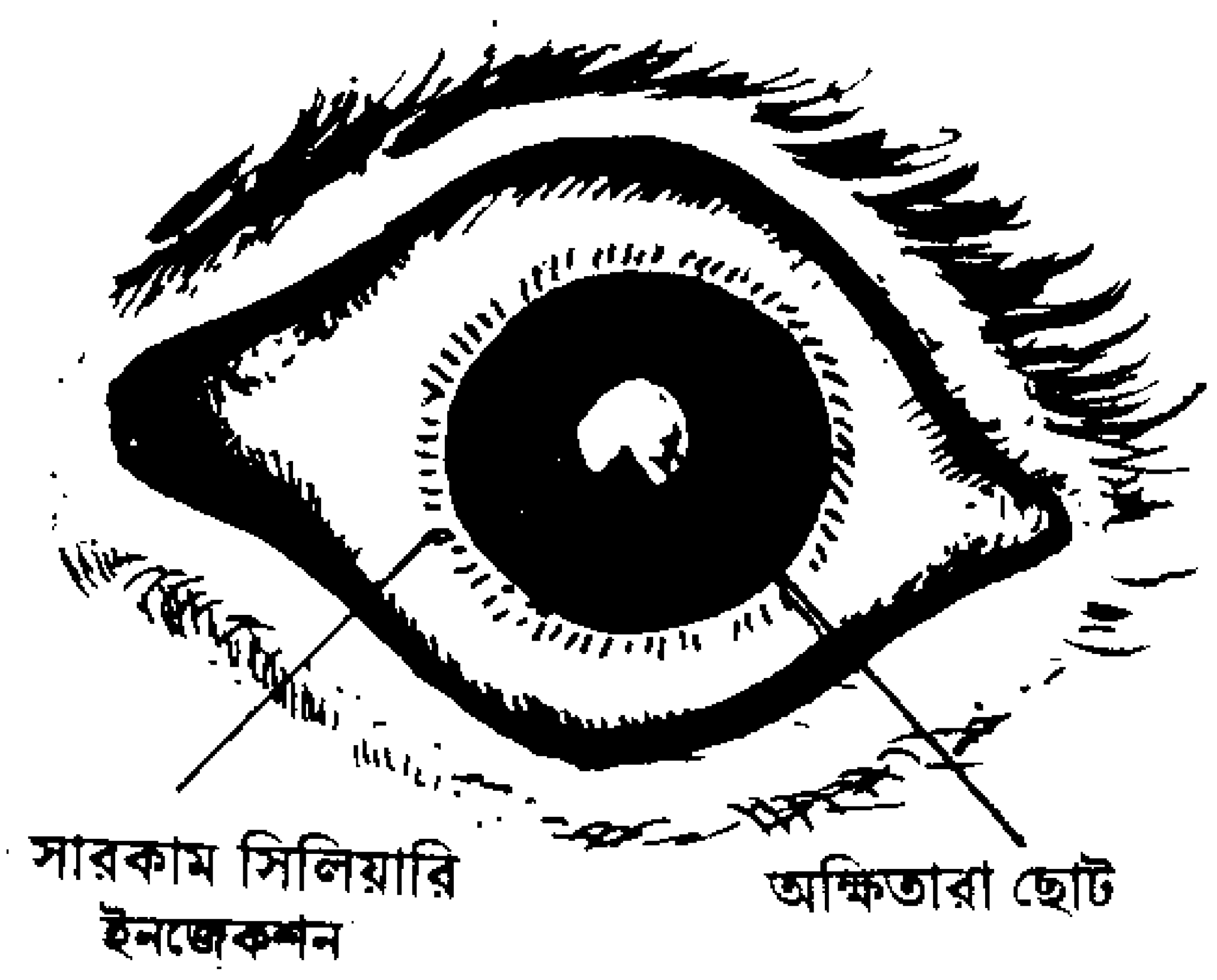

চিত্র ৫০ : আইরিশের প্রদাহ

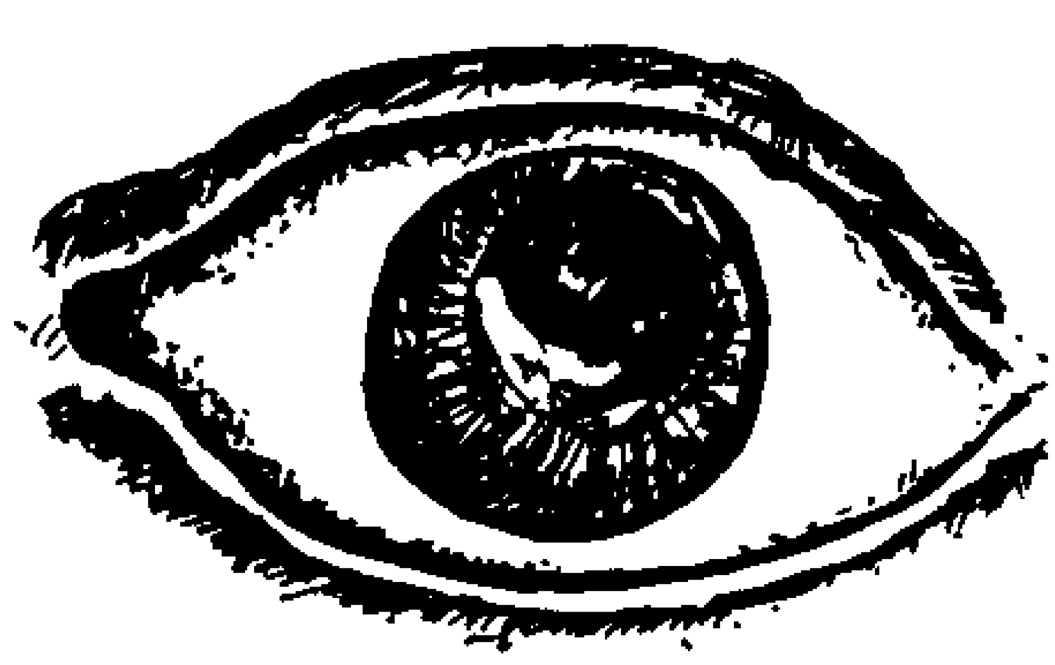

চিত্র ৫১ : সম্মুখ দৃশ্যে পিছনের সাইকেনিয়া

কণীনিকা প্রদাহের রোগতত্ত্ব : কণীনিকা ও সিলিয়ারি বডি উভয়ই রক্তবাহী নালিকা দিয়ে পূর্ণ ফলে এ তন্তুর উত্তেজনা স্বভাবতই ফিব্রিনসমৃদ্ধ তরল পদার্থের ক্ষরণ ঘটায়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের জন্য পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইট (Polymorphonuclear leucocyte), এলার্জি হলে লসিকা কোষ (lymphocyte) এবং গ্রানুলোমেটাস রোগে মনোনিউক্লিয়ার কোষ পাওয়া যায়। কণীনিকার তন্তু অত্যন্ত ঢিলা হওয়ায় এতে তরল বস্তু জমা হয়। ফলে কণীনিকায় শোথ হয় এবং এর খাঁজসমূহ ভরে যায় এবং এটি অনেকটা কাদার রঙ ধারণ করে।

শোথ হওয়ার ফলে চোখের মণির ছোট, বড় হওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়। কণীনিকার সংকোচন ও প্রসারণ মাংসপেশী উভয়ই আক্রান্ত হয়। যেহেতু সংকোচন মাংসপেশী বেশি শক্তিশালী, ফলে চোখের মণি ক্ষুদ্র হয়ে যায়। ফিব্রিনসমৃদ্ধ তরল পদার্থ জলীয় রসের মধ্যেও

দেখা যায়। জলীয় রসের মধ্যে যে ক্ষরণ হয় সেটাতে ব্যাকটেরিয়াজনিত বিষাক্ত পদার্থ থাকে। ফলে নেত্রস্বচ্ছের অন্তঃঝিল্লিতে ভাসমান কোষসমূহ আটকে যায়। এটিকে নেত্রস্বচ্ছের অধঃক্ষেপ (K.P) বলে। হাইপিপয়ন তৈরি হলে কে. পি থাকে না।

কণীনিকায় শোথ হবার ফলে ও উত্তেজনার ফলে লেন্সের সম্মুখভাগের আবরণের সাথে আটকে যায় একে পিছন দিকের সাইনেকিয়া বলে (চিত্র ৫১)।

চিত্র ৫২ : আইরিশ বোমবি

লক্ষণ : কণীনিকার প্রদাহে ট্রাইজিমিনাল স্নায়ুর শাখা–প্রশাখার দিকে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং এটি রাতে বেশি হয়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। সিলিয়ারি রক্তপুঞ্জিভবন, নেত্রবর্ত্মের রক্তাধিক্য, অসুখ মারাত্মক আকার ধারণ করলে অক্ষিপল্লব ও নেত্রবর্ত্ম ফুলে যায়। কণীনিকার রঙ কাদার মতো হয়। চোখের তারা ক্ষুদ্র হয় ও আলোতে প্রতিক্রিয়াবিহীন হয় (চিত্র ৫০)। সংবেদনশীল স্নায়ু উত্তেজিত হবার ফলে চক্ষু দিয়ে পানি পড়ে ও আলোভীতি দেখা যায়। চোখের সম্মুখ প্রকোষ্ঠ অস্বচ্ছ হতে পারে। হাইপোপিয়ন থাকতে পারে। কর্নিয়ার অন্তঃঝিল্লিতে কে. পি. পাওয়া যায়। ডিসিমেন ঝিল্লীতে ভাঁজ পড়তে পারে। কাচীয় রসের মধ্যে অস্বচ্ছতা থাকতে পারে।

রোগ নির্ণয়

১. চোখে অসহ্য ব্যথা হয়।

২. সিলিয়ারি রক্ত পুঞ্জিভবন হয়।

৩. কণীনিকা কাদার রং ধারণ করে।

৪. নেত্রস্বচ্ছের অন্তঃঝিল্লিতে K.P. থাকে।

চিকিৎসা

১. কারণ খুঁজে বের করে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করতে হয়।

২. **স্থানীয় চিকিৎসা :** এট্রোপিন ফোঁটা ১% দিনে তিনবার ব্যবহার করতে হয়। এটি সিলিয়ারি বডির বিশ্রামে রাখে, চোখের মণি বড় ও রক্তবাহী নালিকাসমূহকে বড় করে ওষুধ পৌছাতে সাহায্য করে। উত্তেজনা কমার জন্য হাইড্রোকর্টিশন এসিটেট ১% ফোঁটা প্রতি দু'ঘন্টা পর পর ব্যবহার করা উচিত। যদি এতে না কমে তবে করটিসোন ইনজেকশন অক্ষিকোটরের মেঝেতে দিতে হয়।

কণীনিকা প্রদাহের জটিলতা

১. পরবর্তী সময়ে চোখের উচ্চচাপ বা গ্লুকোমা হতে পারে।

২. চোখের সম্পূর্ণ তারা, লেন্সের সম্মুখভাগের আবরণের সাথে যুক্ত হয়ে Seclusio pupillae করে।

৩. কণীনিকা ধনুকের মতো বেঁকে যেতে পারে। কারণ সাইনেকিয়া হওয়ার ফলে পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ হতে জলীয় রস সম্মুখ প্রকোষ্ঠে আসতে পারে না। ফলে জলীয় রসের চাপে কণীনিকা সামনের দিকে ফুলে উঠে। একে iris bombi বলে। এটির সাথে গ্লুকোমা থাকতে পারে (চিত্র ৫২)।

৪. Occlusio pupillae : চোখের ভিতরের ক্ষরণ এক হয়ে সম্পূর্ণ চোখের তারা বন্ধ করে দিতে পারে (চিত্র ৫৩)।

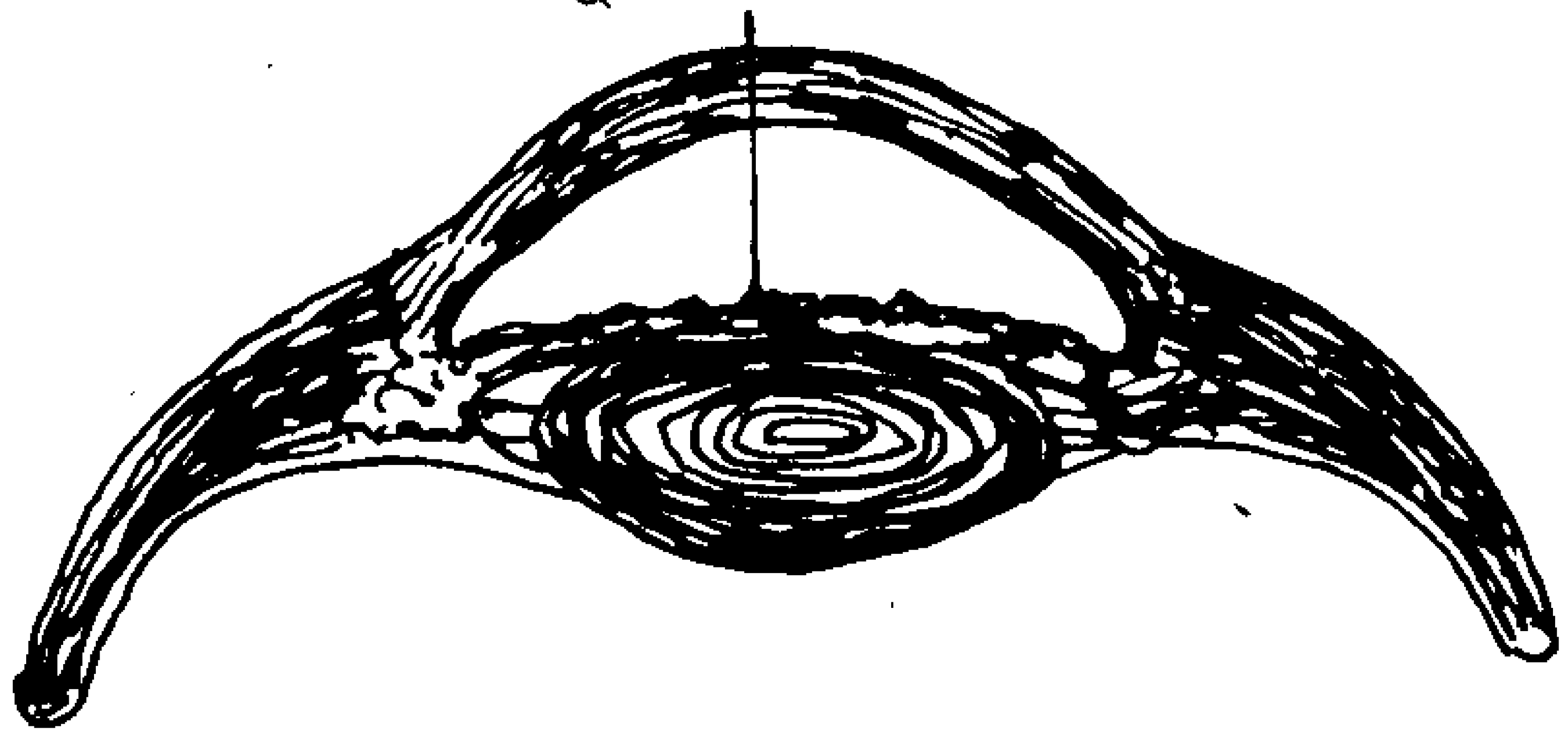

চিত্র ৫৩ : অক্লুসিও পিউপিলি

৫. **সাইক্লাইটিক ঝিল্লি :** উত্তেজক ক্ষরণ একত্রিত হয়ে ভিট্রিয়াসের সম্মুখভাগে একটি পর্দার সৃষ্টি করতে পারে। এটিকে সাইক্লাইটিক ঝিল্লি বলে।

৬. **জটিল ছানি :** সম্পূর্ণ লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে চকের মতো সাদা হয়ে যায়।

৭. **অক্ষিপটের বিচ্ছেদ :** সাইক্লাইটিক ঝিল্লীর সংকোচনের ফলে অক্ষিপটের বিচ্ছেদ ঘটে।

৮. **Pthysis Bulbi :** চোখ নরম, সংকুচিত হয় ও দৃষ্টিশক্তি থাকে না।

ঘ.১ হঠাৎ আক্রান্ত তীব্র পুঞ্জিভূত উচ্চচাপ (Acute congestive glaucoma) **:** এটি প্রাথমিক কোণ বন্ধজনিত চোখের উচ্চচাপের (primary narrow angle glaucome) অন্তর্গত। কণীনিকার প্রান্ত দিয়ে কোণ বন্ধ হলে জলীয় রস বের হতে পারে না বলে উচ্চচাপ দেখা দেয়। এটি দু'চোখেই হয় তবে এক চোখে আগে হয়। সাধারণত ৪০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে রোগীদের হয় এবং মেয়েদের বেশি হয়। এ রোগ বংশগত কারণে হতে পারে। কিছু পূর্বপ্রবণ উপাদানের জন্যও হতে পারে। এগুলো হচ্ছে—

(ক) চোখের গঠন সম্পর্কিত উচ্চচাপ

লেন্সের আকার : লেন্স সারাজীবন ধরে বাড়তে পারে। সামনের দিকে বেড়ে যাওয়ার ফলে লেন্স নেত্রস্বচ্ছের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে এবং লেন্সের প্রান্তের বৃদ্ধির ফলে লেন্সের বন্ধনী ঢিলা হয়। ফলে কণীনিকা ও লেন্স সামনে চলে যায়। এতে সম্মুখ প্রকোষ্ঠের গভীরতা কমে যায়।

নেত্রস্বচ্ছের ব্যাস ছোট থাকে।

অক্ষিগোলকের দৈর্ঘ্য : ছোট চোখ সাধারণত দূরদৃষ্টিবদ্ধ (hypermetropia) হয়, কর্নিয়ার ব্যাস ছোট থাকে এবং মোটা লেন্স সামনের দিকে থাকে।

(খ) চোখের কার্যবিধি সম্পর্কিত উচ্চচাপ

বর্তমানে দুটি সূত্রের সাহায্যে প্রাথমিক কোণ বন্ধজনিত হতে পারে বলে ধারণা করা হয় তা নিম্নরূপ—

১. **প্রসারক মাংসপেশী সম্পর্কিত :** প্রসারক মাংসপেশী সংকোচনের ফলে কণীনিকা ও লেন্স পরপর লেগে যায়। এতে অক্ষিতারা বন্ধ হয়ে যায়। পিছনের প্রকোষ্ঠের চাপ বাড়ার ফলে কণীনিকা বেঁকে যায়। একে বাঁকা (iris bombi) বলে।

২. **সংকোচন মাংসপেশী সম্পর্কিত :** যখন অক্ষিতারার ব্যাস ৪ মি.মি. হয় তখন সংকোচন মাংসপেশীর অক্ষিতারা বন্ধ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

লক্ষণ

১. হঠাৎ অসহ্য ব্যথা শুরু হয়। এ ব্যথা পঞ্চম কেন্দ্রীয় স্নায়ুর শাখা-প্রশাখা দিয়ে বিস্তার লাভ করে।

২. তীব্র মাথা ব্যথা থাকে।

৩. রোগী হঠাৎ করে কিছুই দেখতে পারে না। কারণ নেত্রস্বচ্ছে শোথ হয় উচ্চচাপের কারণে।

৪. আলোভীতি ও চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

নিদানিক নিদর্শন

১. অক্ষিপল্লবে শোথ হয়।

২. সিলিয়ারি ও নেত্রবর্ত্মে রক্তপুঞ্জিভবন হয়।

৩. নেত্রস্বচ্ছে উপঝিল্লীর শোথ হয় ও সংবেদনশীলতা কমে যায়।
৪. সামনের প্রকোষ্ঠের গভীরতা খুবই কমে যায়।
৫. অক্ষিতারা খাড়াখাড়িভাবে প্রসারিত হয় (চিত্র ৫৪)।

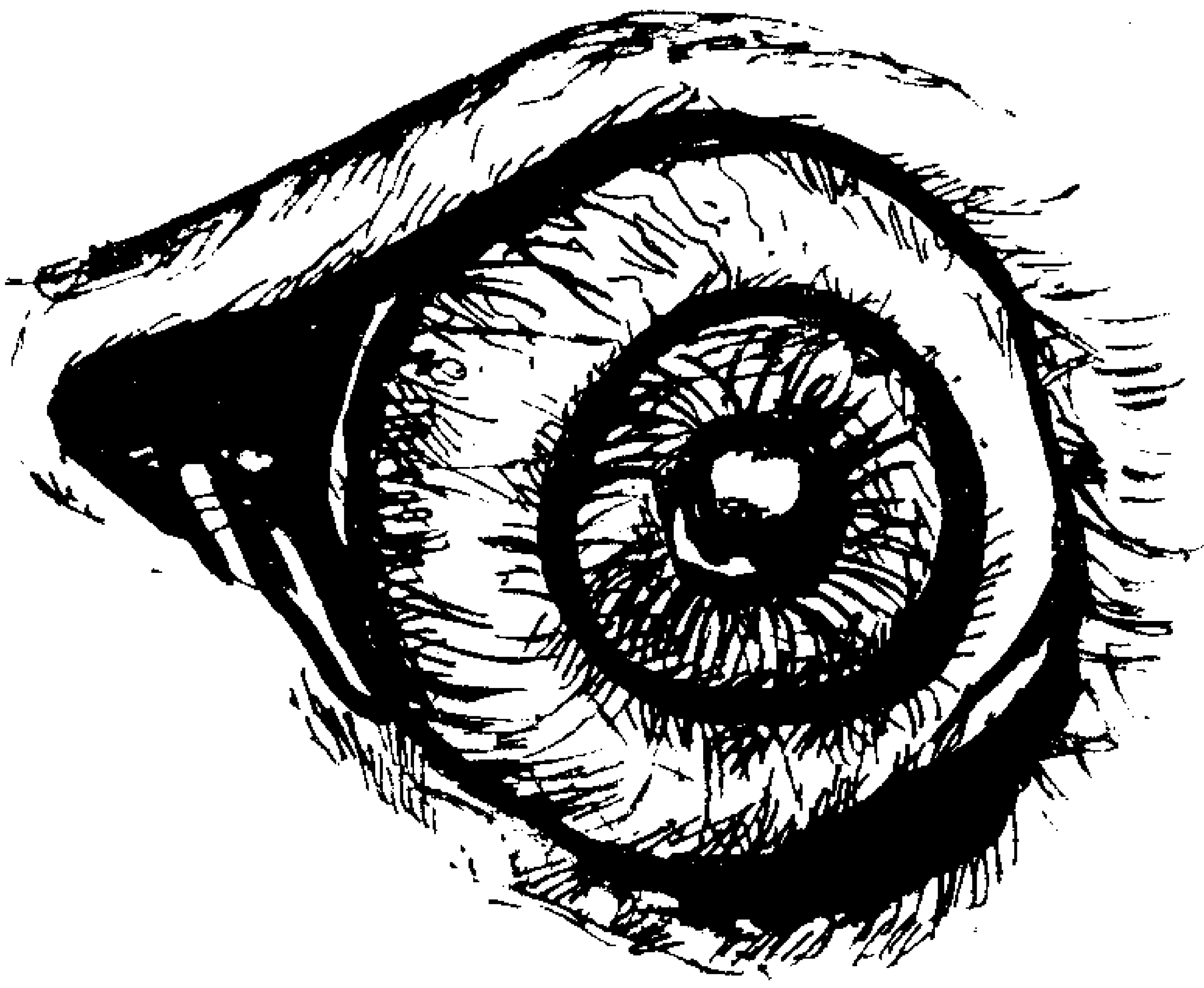

চিত্র ৫৪ : হঠাৎ আক্রান্ত তীব্র পুঞ্জিভূত উচ্চচাপ

৬. কণীনিকার রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়।
৭. চোখের ভিতরের চাপ অনেকগুণে বেড়ে যায় এবং অক্ষিগোলকে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়।
৮. দৃষ্টিশক্তি কমে এতটুকু হয়ে যে, রোগী শুধু আলো অনুভব করতে পারে।
৯. এ ছাড়াও কিছু শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণও দেখা যায়, রোগী বমি করে, জ্বর হয়, নাড়ীর গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও অনিয়মিত হয়।

চিকিৎসা

এ ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য রোগীকে ভর্তি করলে খুবই ভাল হয়।

(১) Pilocarpine drop : ফোঁটা নিম্নলিখিতভাবে দিতে হয়– ১%, ২%, ৪%

১ ফোঁটা	করে	প্রতি	১	মিনিট	পরপর	৫	মিনিট	ধরে	
১	”	”	”	৫	”	”	১৫	”	”
১	”	”	”	১৫	”	”	$\frac{১}{২}$	ঘণ্টা	”
১	”	”	”	$\frac{১}{২}$	ঘণ্টা	”	২	”	”
১	”	”	”	১	”	”	২	”	”
১	”	”	”	২	”	”	৪	”	”
১	”	”	”	দৈনিক ৪ বার চলতে থাকবে।					

(২) Acetazolamide tab : প্রথমে দু'টি বড়ি একসাথে। পরে ১ টি করে বড়ি দৈনিক তিনবার। এ সাথে পটাসিয়াম বড়ি বা সিরাপ দেওয়া হয়। এ চিকিৎসায় যদি নেত্রস্বচ্ছের অস্বচ্ছতা কমে যায়, ব্যথা কমে যায় এবং রোগী দেখতে পায় তখন বুঝতে হবে যে উচ্চচাপ কমে গিয়েছে। আর যদি উপরোক্ত চিকিৎসায় যদি চাপ না কমে তবে গোনিওস্কোপের সাহায্যে সামনের প্রকোষ্ঠের কোণ পরীক্ষা করতে হয়, যদি কোনো $\frac{1}{3}$ ভাগ বন্ধ থাকে তবে 'কণীনিকার প্রান্তের অপসারণ' (peripheral iredectomy) করতে হবে। আর যদি $\frac{2}{3}$ ভাগ কোণ বন্ধ থাকে তবে ট্রাবিকুলেক্টমি (Ttabeculectomy) অস্ত্রোপচার করতে হবে। অস্ত্রোপচার করার সময় ২০% মেনিটল দ্রবণ শিরায় দিতে হয়—এতে চোখের চাপ কমে যায় এবং অস্ত্রোপচারের জন্য জটিলতা হতে রেহাই পাওয়া যায়।

ঘ ২. অক্ষিকোটরের কোষের প্রদাহ : অক্ষিকোটরের কলাসমূহের পুঁজযুক্ত প্রদাহকে অক্ষিকোটরের কোষের প্রদাহ (orbital cellulitis) বলে (চিত্র ৫৫)।

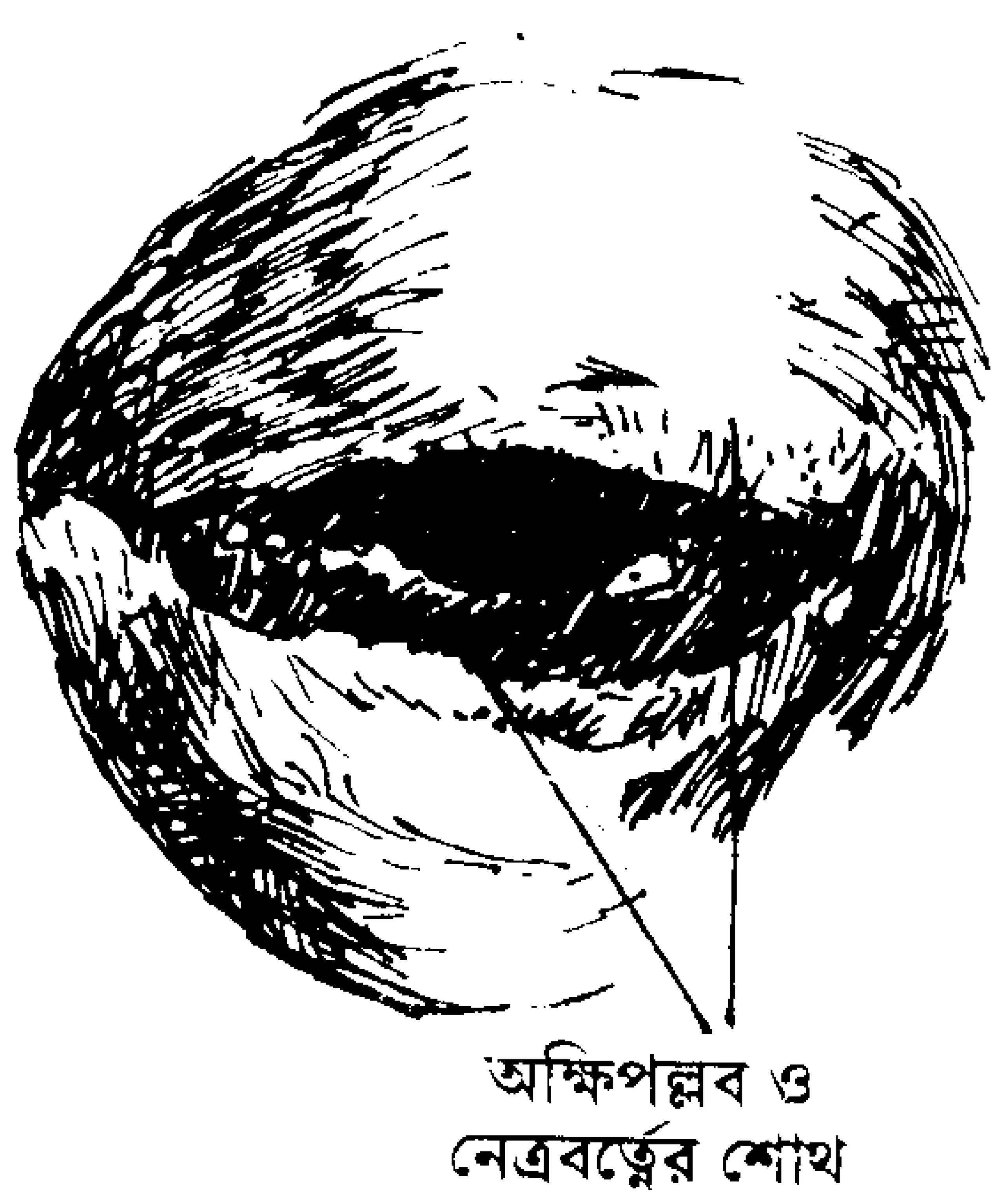

চিত্র ৫৫ : অক্ষিটোকরের কোষের প্রদাহ

কারণ

১. নাকের সাইনাস এবং দাঁতগহ্বর থেকে সংক্রমিত সংক্রমণ।
২. চোখের ভিতর থেকে সংক্রমণ যেমন প্যানঅপথ্যালমাইটিস।
৩. দৈহিক ব্যাধি হতে যেমন এনকেফালাইটিস, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি
৪. ভেদক আঘাত যা অক্ষিগোলককে ছিদ্র করে এতে জীবাণু সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ ও নিদর্শন (Symptoms & sign) : চোখের পাতা লাল হয়ে ফুলে যায়, অক্ষিকোটরে অসহ্য ব্যথা যা চোখ নড়াচড়াতে বেড়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যায়। চোখ ঠিকমত নড়াচড়া করতে পারে না ফলে একবস্তু একাধিক দেখায়। রোগীর জ্বর থাকে, চোখ দিয়ে পানি

পড়ে, আলোভীতি দেখা দেয়। নেত্রবর্ত্ম খুব ফুলে যায়, চোখ অক্ষিকোটর থেকে বেরিয়ে পড়ে। অধোদেশ বা ফানডাস পরীক্ষা করলে অপটিক স্নায়ুর মাথা ও শিরাগুলো ফুলা দেখা যায়।

জটিলতা

১. সম্পূর্ণ চোখের প্রদাহ (panophthalmitis)
২. পুঁজযুক্ত মেনিনজাইটিস (purulent meningitis)
৩. অপটিক স্নায়ু শুকে যাওয়া (optic atrophy)
৪. মস্তিষ্কের পুঁজাশয় (cerebral abscess)
৫. কেভারনাস সাইনাস থ্রোমবোসিস (cavernous sinus thrombosis).

চিকিৎসা : উচ্চ পর্যায়ের এন্টিবায়টিক মাংসে উপযুক্ত মাত্রায় সাথে সাথে শুরু করতে হয়। পুঁজাশয় হলে অস্ত্রোপচার করে পুঁজ বের করে দিতে হয়। ব্যথা নিবারক ওষুধ মুখে খাওয়াতে হয়।

ঘ.৩ কেভারনাস সাইনাস থ্রোমবোসিস :

কারণ

১. অক্ষিকোটর ও মুখমণ্ডলের সংক্রমণ অফথ্যালমিক শিরার মাধ্যমে ক্যাভারনাস সাইনাসে পৌঁছে।
২. মধ্যকর্ণ হতে সংক্রমণ ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস দিয়ে সেখানে পৌঁছে।
৩. মাথার পাশের সংক্রমণ সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস দিয়ে সেখানে পৌঁছে।
৪. মুখ ও নাকের সাইনাস থেকে সংক্রমণ টেরিগয়েড প্লেক্সাসের মাধ্যমে সেখানে পৌঁছে।

লক্ষণ ও নিদর্শন : এগুলো অক্ষিকোটরের প্রদাহের মতোই কিন্তু খুবই বেশি আকার ধারণ করে। এ ছাড়াও অতিরিক্ত লক্ষণ হচ্ছে কানের পিছনে মাসটয়েড এলাকা খুব ফুলে যায়। জ্বর, কাঁপুনি ও বমি হতে দেখা যায়। বিপরীত দিকের কেভারনাস সাইনাস আক্রান্ত হলে বিপরীত দিকে লেটারাল রেকটাস মাংসপেশী প্যারালাইসিস হয়। পরবর্তীতে তৃতীয়, চতুর্থ, ৬ষ্ঠ, কেন্দ্রীয় স্নায়ু আক্রান্ত হলে অক্ষি গোলকের নড়াচড়া বন্ধ হয়, কর্নিয়ার সংবেদনশীলতা কমে যায় এবং অক্ষিতারা প্রসারিত হয়।

চিকিৎসা

অধিক মাত্রায় উচ্চ পর্যায়ের এন্টিবায়টিক ও জমাট বিরোধী ওষুধ দিতে হয়।

ঘ ৪. আঘাত : অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঙ ১. অঞ্জনি (Stay) **:** অক্ষিপল্লবের প্রান্তে জেইস গ্রন্থির স্টেফাইলোকক্কাস জীবাণু দ্বারা পুঁজজনিত সংক্রমণকে অঞ্জনি বলে (চিত্র ৫৬)।

চিত্র ৫৬ : অঞ্জনি

লক্ষণ ও নিদর্শন : অক্ষিপল্লবের প্রান্তে লাল হয়ে ফুলে উঠে, ব্যথা করে। পরে সাদা বা হলুদ রঙের পুঁজযুক্ত স্থান অক্ষিপল্লবের প্রান্তে দেখা যায়। এটি সকল বয়সীদের দেখা যায়। কিছুদিন পর পর হতে দেখা যায়।

চিকিৎসা

১. আক্রান্ত স্থানে গরম শেক দেওয়া হয়।
২. এন্টিবায়টিক ও ব্যথা নিবারক বড়ি মুখে যেতে দিতে হয়।
৩. যখন পুঁজযুক্ত স্থান দেখা যায় তখন চোখের পাপড়ি তুলে বা ছোট করে চামড়া কেটে পুঁজ বের করা হয়।

৬ ২. ম্যাবোমিয়াম সিস্ট-এর প্রদাহ : এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী লাইপোগ্রানুলুমেটাস্ প্রদাহ যা ম্যাবোমিয়াম গ্রন্থির নালী বন্ধের কারণে হয় (চিত্র ৫৭)।

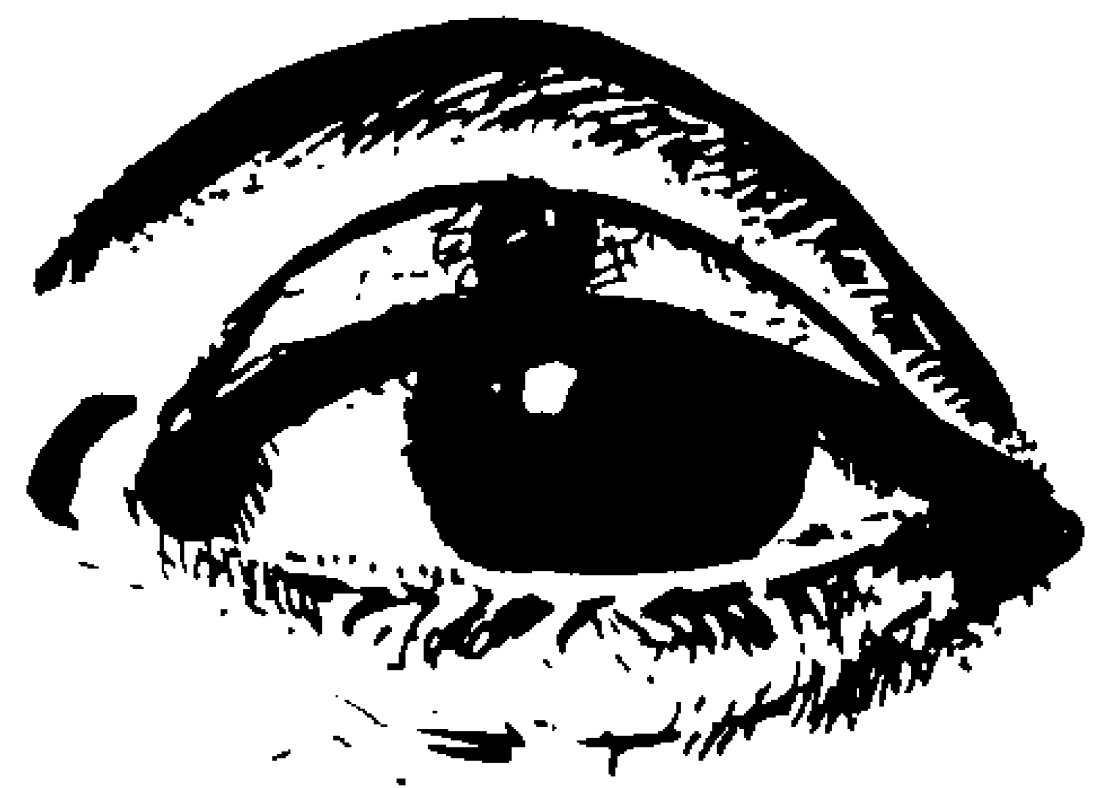

চিত্র ৫৭ : ক্যালজিয়ন বা মেমোসিয়াল সিস্টের প্রদাহ

লক্ষণ ও নিদর্শন : অক্ষিপল্লবের প্রান্ত হতে কিছু দূরে অক্ষিপুটে ছোট, ব্যথামুক্ত ফোলা দেখা যায়। ফোলার উপরের চামড়া মুক্ত থাকে কিন্তু ফোলা অক্ষিপুটের সাথে যুক্ত থাকে। চোখের পাতা উল্টিয়ে দেখা যায় যে—অক্ষিপুটের নেত্রবর্ত্মে লালাভ স্থান দেখা যায়।

চিকিৎসা : যদি ছোট হয় এমনিতেই সেরে যায়। যদি বড় হয় তবে অস্ত্রোপচার করতে হয়। পরে এন্টিবায়টিক মলম দিয়ে ২ ঘন্টা বেঁধে রাখতে হয়। মুখে এন্টিবায়টিক বড়ি খেতে দিতে হয়।

চ ১. এনডোক্রাইন গ্রন্থির অস্বাভাবিকতার ফলে : থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিকতার ফলে Graves disese হয়। এটি সাধারণত ২০–৪৫ বৎসর মেয়েদের বেশি হয়ে থাকে। এতে থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হতে দেখা যায়। অক্ষিপল্লব সংহরণ (retraction) হয়। চোখের বাইরের মাংসপেশী ফুলে যায়। নেত্রবর্ত্মে রক্ত জমে ও ফুলে যায়। পরে চোখের পাতা ফুলে যায়। চোখ বেরিয়ে আসে। এ অসুখ অত্যন্ত ভয়াবহ। থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করতে হয়। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বিশারদ ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ মিলিতভাবে এর চিকিৎসা করে থাকেন।

চ ২. ক্যানসার : চোখের বাইরে ও চোখের ভিতরের ক্যানসারে চোখ লাল হয়।

* তিনটি লাল চোখের রোগ নির্ণয়ের পার্থক্যসমূহ যা সচরাচর ঘটে

	নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ (Acute Conjunctivitis)	কণীনিকার প্রদাহ (Acute iritis)	হঠাৎ চোখের উচ্চচাপ (Acute glaucoma)
(১) ব্যথা	ব্যথা তেমন থাকে না	ব্যথা মাঝারি পর্যায়ে থাকে	ব্যথা খুব বেশি থাকে
(২) ক্ষরণ	পানির মত অথবা পুঁজযুক্ত	সাধারণত থাকে না	খুব পানি পড়ে
(৩) আলোভীতি	সামান্য	খুবই বেশি	মধ্যম পর্যায়ে আলোভীতি দেখা যায়
(৪) কর্নিয়া	উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ	ঘোটালো	বেশ ঘোটালো
(৫) অক্ষিতারা	স্বাভাবিক	ছোট অথবা সংকুচিত	প্রসারিত, আলোতে সংকোচন করে না
(৬) চোখের চাপ	স্বাভাবিক	স্বাভাবিক	বেশি থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

চোখের প্রেসার ও তার প্রতিকার

অন্ধত্ব মানুষের জীবনে একটি অভিশাপ। অন্ধত্ব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বিষময় অধ্যায়। মানুষ যখন তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোনো আলো বা বস্তু দেখতে পায় না অথবা স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না তাকেই আমরা অন্ধ বলে থাকি।

সারা দুনিয়ায় অন্ধত্বের সংখ্যা ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে বাংলাদেশের মতো দেশসমূহে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অন্ধত্বের কারণসমূহ নিরূপণ করা এবং তার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশে অন্ধত্বের অন্যতম কারণসমূহ হলো

১. ছানি।
২. ভিটামিন "এ" র স্বল্পতা (বিভিন্ন কারণে যেমন ডাইরিয়া, হাম)
৩. চোখের উচ্চ চাপ।
৪. বিভিন্ন ধরনের আঘাত ও প্রদাহ (যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি)
৫. অন্যান্য।

চোখের চাপ

শরীরের যে কোনো ফাঁকা অঙ্গ যা বহিঃদেশে শক্ত অবরণ দিয়ে আবৃত তাদের সবারই নিজস্ব অন্তঃচাপ আছে। যেহেতু চোখ একটি গোলাকার অঙ্গ এবং আধাশক্ত আবরণ দ্বারা আবৃত এবং ভিতরে রয়েছে তরল পদার্থের সমাবেশ। কাজেই চোখের নিজস্ব চাপ আছে। এমনিভাবে শিরা, ধমনী, হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদির রক্তচাপ আছে। এ চাপ আমরা যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা হয় এবং মি: মি: পারদে প্রকাশ করা হয়। চোখের প্রেসার বা চাপ বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে মাপা হয়। এবং তার ফল বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করা হয়। আমরা সাধারণত হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে যে যন্ত্রের সাহায্যে চোখের চাপ পরিমাপ করা হয় তাকে "সিয়জ টনোমিটার" বলে। চোখের সাধারণ চাপ (সিয়জ টনোমিটার) ১৫–২১ মি: মি: পারদ। এটি যদি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পায় তখন এটি চোখের ক্ষতি সাধন করে। এ অবস্থাকে আমরা চক্ষুর উচ্চ চাপজনিত অসুখ বা গ্লুকোমা বলে থাকি। গ্লুকোমা সারা বিশ্বে অন্ধত্বের একটি অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে ৪০ বৎসরের উর্ধ্বে ১.৫–২% লোক গ্লুকোমা রোগে ভোগে এবং এর মধ্যে ৬০–৭০% "ক্রনিক সিম্পল গ্লুকোমা"। জন্মগত চোখের উচ্চ চাপের হার ০.৩–০.০৭৯% এবং এর ভিতর পুরুষের বেশি হয়ে থাকে।

চোখের চাপের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ

যেহেতু আমরা আগেই বলেছি যে, চোখের অন্তরভাগে তরল পদার্থের সমারোহ রয়েছে। এ পদার্থের ভিতর পানিজাতীয় একটি পদার্থ আছে তাকে জলীয় রস (aqueous) বলা হয়। এ aqueous চক্ষুগোলকে অন্তঃভাগে সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ পথে প্রবাহিত হয়ে চক্ষু আবরণে শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে চক্ষুগোলকে স্বাভাবিক চাপ রক্ষা করে। এ

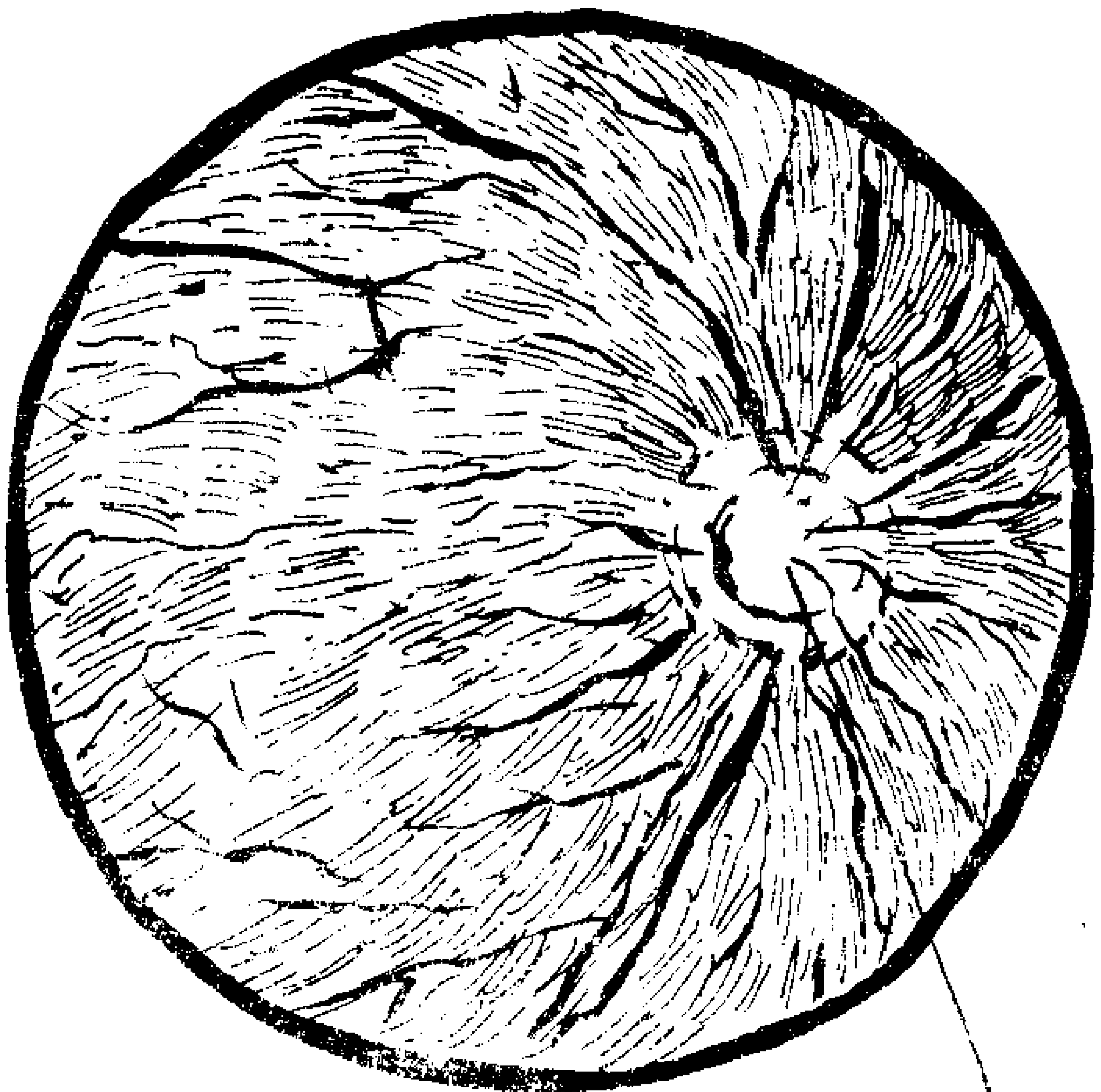

চিত্র ৫৮ : চোখের উচ্চচাপে কাটিং দেখানো হয়েছে

স্বাভাবিক চাপই ১৫–২১ মি: মি: পারদ। যে কোনো কারণে যদি এ aqueous প্রবাহের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় বা বন্ধ হয় তখন চোখে অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায় এবং পরিশেষে চক্ষু গোলকের প্রধান স্নায়ু (optic nerve)-কে চাপ মেরে ফেলে এবং চিরতরে দৃষ্টিহানি ঘটে এবং অন্ধত্ব হয়।

গ্লুকোমার প্রকারভেদ

যদিও গ্লুকোমার নির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি তবে এটি—

(১) জন্মগত গ্লুকোমা।
(২) জন্মের পরবর্তীকালে গ্লুকোমা।

জন্মগত গ্লুকোমা (Congenital glaucoma)

চক্ষু বিশেষজ্ঞদের মতে genetic factor এ গ্লুকোমার একটি অন্যতম কারণ। যার ফলে এটি বংশপরম্পরাক্রমে হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অন্যান্য কারণে জন্মগত গ্লুকোমা হতে পারে। সদ্যজাত শিশু এরূপ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত শিশু শরীরের অন্য কোনো রোগ ছাড়াই অস্বাভাবিকভাবে কাঁদতে থাকে, আলোভীতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এ সমস্ত বাচ্চাদের চোখ সাধারণত গরুর চোখের মতো আকৃতি ধারণ করে। চোখের সামনের কর্নিয়ার পরিধি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়, স্বাভাবিক ১১ মি: মি: কর্নিয়ার

স্বচ্ছতা নষ্ট হয়। ঠিকমত চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ না নিলে বাচ্চা অচিরেই অন্ধত্বের শিকার হয়। ছোট শিশুদের এ অবস্থা দেখা দিলে অতিসত্বর চক্ষু চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে গ্লুকোমা

এ গ্লুকোমা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে।

১. প্রাথমিক ক্ষুদ্রকোণবিশিষ্ট চোখের উচ্চচাপ (primary narrow angle glaucoma)।

২. প্রাথমিক প্রশস্তকোণবিশিষ্ট চোখের উচ্চচাপ (primary open angle glaucoma)।

৩. কারণ গত চোখের উচ্চচাপ (secondary glaucoma)।

সাধারণত গ্লুকোমার রোগীরা যে সমস্ত উপসর্গের বর্ণনা দেয় তা হলো

১. অসহ্য তীব্র, চোখ ও মাথা ব্যথা। এ ব্যথা অন্ধকার ঘরে বসে হতে পারে।

২. চোখ ও চোখের পাতা ফুলে যাওয়া এবং অতিরিক্ত মাত্রায় চোখ লাল হওয়া।

৩. আলোতে চোখে রংধণুর মতো দেখা।

৪. কোনো সময়ে অল্পব্যথা এবং চোখের কোনো উপসর্গ ছাড়াই ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টিহানি ঘটে এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিহানি হয়। এটি সাধারণত বয়স্ক লোকদের হয়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করলে যে সমস্ত লক্ষণ পায় তা হলো

   ক. চোখের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে অতিমাত্রায় বেড়ে যায়।

   খ. চক্ষু গোলকের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। দৃষ্টিশক্তির পরিধি সীমিত হতে হতে টিউব আকৃতি হয়ে যায় এবং চোখের ভিতর পরীক্ষা করলে optic nerve-এর মাথা নিচের দিকে বসে যায় (cuping) এবং পরবর্তীকালে চোখে আলো বুঝতে পারে না (চিত্র ৫৮)

চিকিৎসা

১. মেডিক্যাল।

২. সার্জারি

৩. লেসার রশ্মি।

প্রতিকার

১. প্রাথমিক চক্ষু পরিচর্যা সরকারী হাসপাতালে বা বেসরকারী পর্যায়ে এ সমস্ত রোগ নির্ণয় করতে হলে নিয়মিত চোখের চাপ মাপা। বাচ্চাদের ভালভাবে চোখ পরীক্ষা করা।

২. জন্মগত চোখের উচ্চচাপ প্রতিরোধ করতে হলে

   (ক) Genetie councilling করতে হয়।

   (খ) শিশুর মাকে পারিপার্শ্বিক দুষণের হাত হতে রক্ষা করা।

৩. প্রাথমিক ক্ষুদ্রকোণবিশিষ্ট চোখের উচ্চচাপ রোধ করা সম্ভব। চোখের সামনে কোণের পরিমাণ নির্ণয়।

৪. প্রাথমিক প্রশস্তকোণবিশিষ্ট চোখের উচ্চচাপ রোধ করা সম্ভব—
optic dise cupping নির্ণয়
I. O. P (সিয়ুজ টোনোমিটারের সাহায্যে) (চিত্র ৬০)

৫. কারণগত চোখের উচ্চচাপ (secondary glaucoma) প্রতিরোধ করা যায়—
I. O. P. নির্নয় করা চোখের রোগের ইতিহাস।

এ সমস্ত রোগীদের প্রতিকার করতে হলে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে Glaucoma Screeming Centre থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ সমস্ত centre এ ৩৫ বছরের উর্ধ্বে লোকদের প্রতি ৩ মাস পর পর চোখের চাপ মাপা উচিত।

সহজ পদ্ধতিতে গ্লুকোমা নির্ণয়ের জন্য Dr. Darmato এবং তার সহযোগীর উদ্ভাবিত উন্নত ও সহজ পদ্ধতি

ড. বাটিল ডারমাটো এবং তার সহযোগী সহজ পদ্ধতিতে চোখের দৃষ্টি পরিমণ্ডলের এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছেন যা দ্বারা অতি অল্প সময়ে (৪–৭) মি:) অনেক বেশি রোগীর গ্লুকোমা নির্ণয় করা সম্ভব (চিত্র ৫৯)। এ পদ্ধতিকে চোখের গতিশীল দৃষ্টিশক্তির

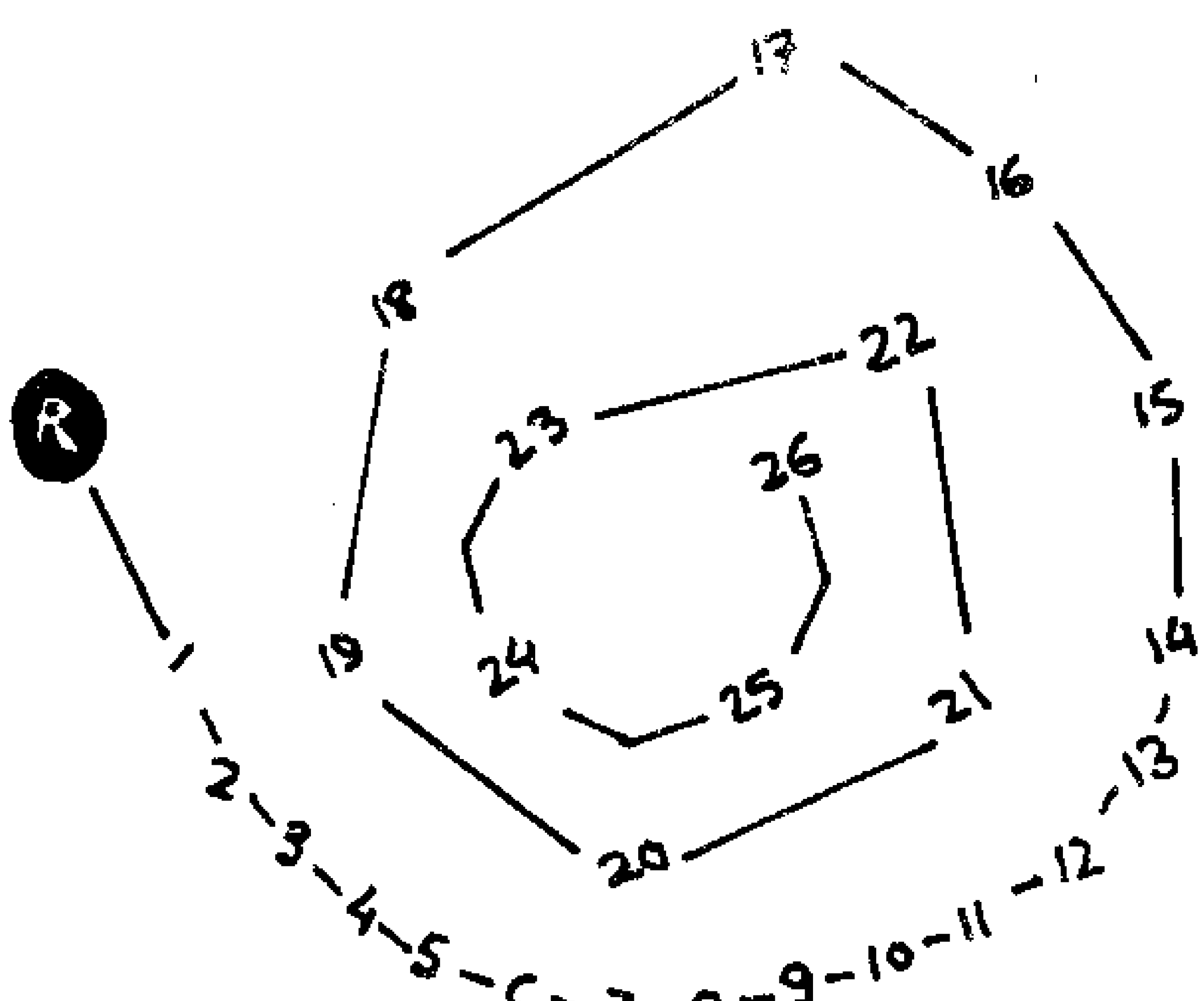

চিত্র ৫৯ : ডার্মাটোর চার্ট

পরিমণ্ডল (oculo-kenetic perimetry) বলে। এখানে উত্তেজক বস্তু স্থির থাকে এবং দৃষ্টি এক উত্তেজক বস্তু হতে অপর উত্তেজক বস্তুতে ধাবিত হয়। এ উদ্ধতিতে চোখের দৃষ্টিশক্তির বাইরে পরিমণ্ডল (peripheral field) নির্ণয় করা যায়।

দৃষ্টিশক্তি বহির্ভূত পরিমণ্ডল নির্ণয় করার উপায় : এ পরীক্ষা করার জন্য একটি কলম, রেকর্ড সিট এবং উজ্জ্বল আলো প্রয়োজন হয়। চোখের গতিশীল দৃষ্টিশক্তির পরিমণ্ডল পরিমাপের বোর্ডটি নিচের ধার টেবিলের উপর ৪০ সে: মি: দূরে রাখতে হয়। ডান চক্ষু পরীক্ষার জন্য বাম চক্ষু বোর্ডের সাথে লাগানো গোলাকার ঢাকনি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এবং ডান হাত দিয়ে চার্টটি ধরতে হবে। এর পর বোর্ডে যে স্থানে 'R' লিখিত আছে যে স্থানে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে। এর পর প্রতি ১ সেকেন্ড পর পর একটি নম্বর পড়ে যেতে হবে।

এভাবে ১ হতে ২৬ পর্যন্ত পড়ে যেতে হবে। যদি কোনো স্থানে নম্বর বা সংখ্যার কালো দাগ না দেখা যায় তখন একটি 'X' চিহ্ন দিতে হবে (চিত্র ৫৯)।

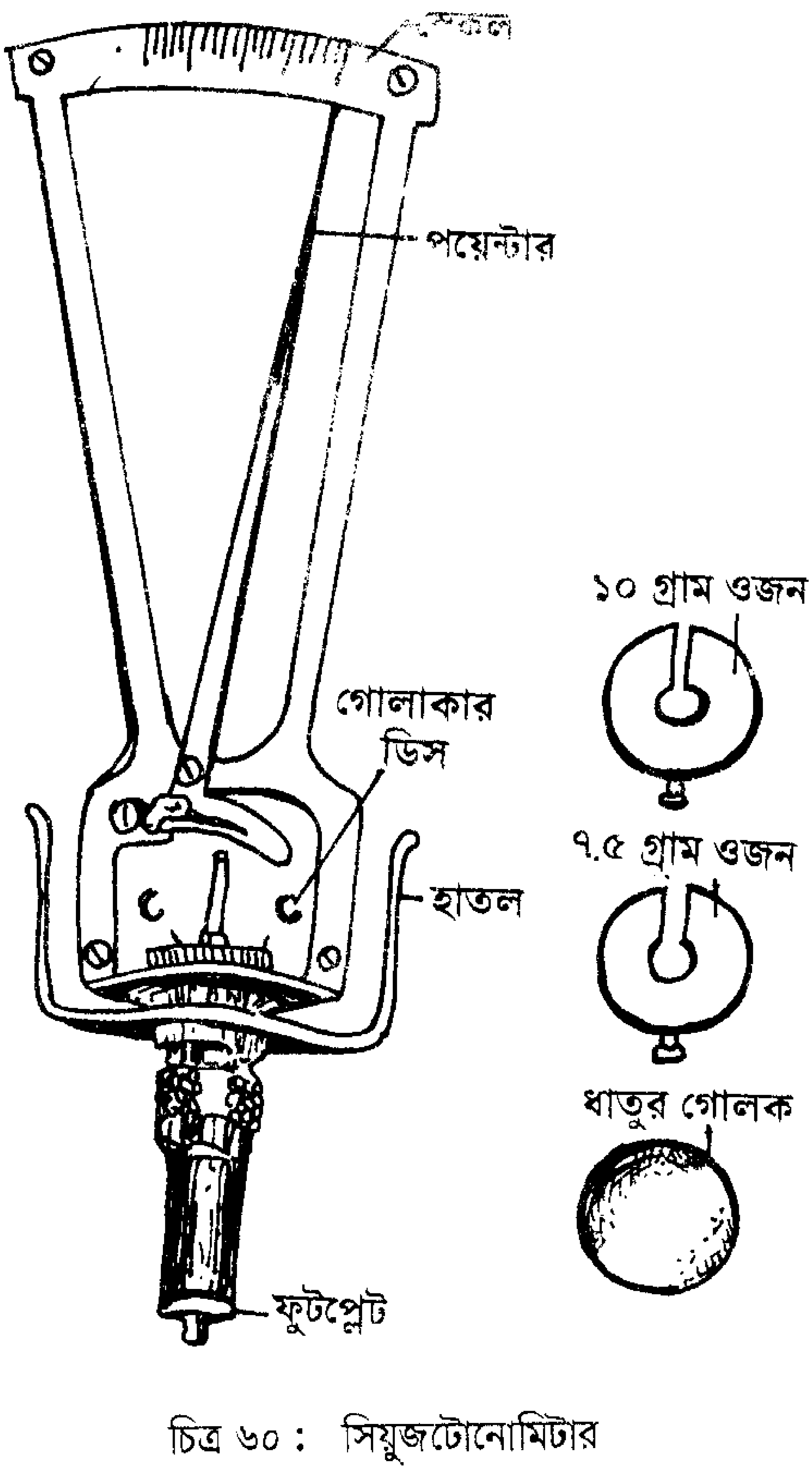

চিত্র ৬০ : সিয়ুজটোনোমিটার

যদি কোনো নম্বরে বারবার কালো দাগ না দেখা যায় তবে সে চক্ষুকে আক্রান্ত চক্ষু বলে ধারণা করে সেটিকে পূর্ণ পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

দ্রুত চিকিৎসার আওতাভুক্ত চোখের রোগ

ক. নিম্নলিখিত অসুখ দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন

১. চোখের রাসায়নিক পোড়া (chemical burn)
২. চোখের অন্তর্ভেদী আঘাত (penetrateig injury)
৩. রেটিনার কেন্দ্রীয় ধমনী বন্ধ হওয়া (centrel retinal artery occlusion)
৪. অক্ষিকোটরের প্রদাহ (orbital cellulitis)
৫. ক্যাভারনাস সাইনাস থ্রোমবসিস (cavarnous sinus thrombosis)

খ. ১ ঘন্টা থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে চিকিৎসা করা উচিত

১. তীব্র পূঞ্জীভূত গ্লুকোমা (acute congestive glaucoma)
২. নেত্রস্বচ্ছের ঘা
৩. নেত্রস্বচ্ছে বিজাতীয় পদার্থ
৪. কণীনিকা প্রদাহ
৫. হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া
৬. রেটিনার বিচ্ছেদ
৭. সম্মুখ প্রকোষ্ঠে রক্তজমা
৮. অক্ষিপল্লব ছিঁড়ে যাওয়া
৯ অক্ষিকোটরের হাড় ভাঙ্গা (blow out fracture of the orbit)
১০. তীব্র নেত্র থলির প্রদাহ (acute dacrocystitis)

গ. এক দিনের মধ্যে চিকিৎসা করা প্রয়োজন

১. অপটিক স্নায়ুর প্রদাহ
২. চোখ বেরিয়ে আসা (protrusion of eye)
৩. পূর্বের গ্লুকোমা এখন নিরূপণ হলো (Previously undiagnosed. ED. glaucoma)
৪. পূর্বের অক্ষিপটের বিচ্ছেদ (old retinal detachment)
৫. চোখের টিউমার প্রভৃতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য : পূর্বের অধ্যায়ে এগুলোর কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বাঁকী যেগুলো সচরাচর ঘটে (common) এগুলো এখানে বর্ণনা করা হলো।

তীব্র অশ্রুথলির প্রদাহ (acute dacrocytitis)

অশ্রু থলির হঠাৎ পুঁজযুক্ত প্রদাহকে তীব্র অশ্রুথলির (acute dacrocystitis) প্রদাহ বলে।

কারণ : পুরানো অশ্রুথলির প্রদাহের হঠাৎ নতুন রূপের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। *Streptococcus haemolyticus* জীবাণু দিয়ে সাধারণত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও *Pneumococcus* এবং *staphylococcus aureus* ও এটি করে থাকে।

লক্ষণ : অশ্রুথলির এলাকা লাল হয়ে ফুলে যায়। তাতে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয় এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করলে গরম অনুভূত হয়। জ্বর জ্বর ভাব থাকে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে। চোখের পাতা ও নাকের পাশ ফুলে যায়। কনজাংটাইভা লাল হয় এবং স্ফীত হয়। ম্যাক্সিলার নিচে লাসিকাগ্রন্থিসমূহ ফুলে যায় (চিত্র ৬১)।

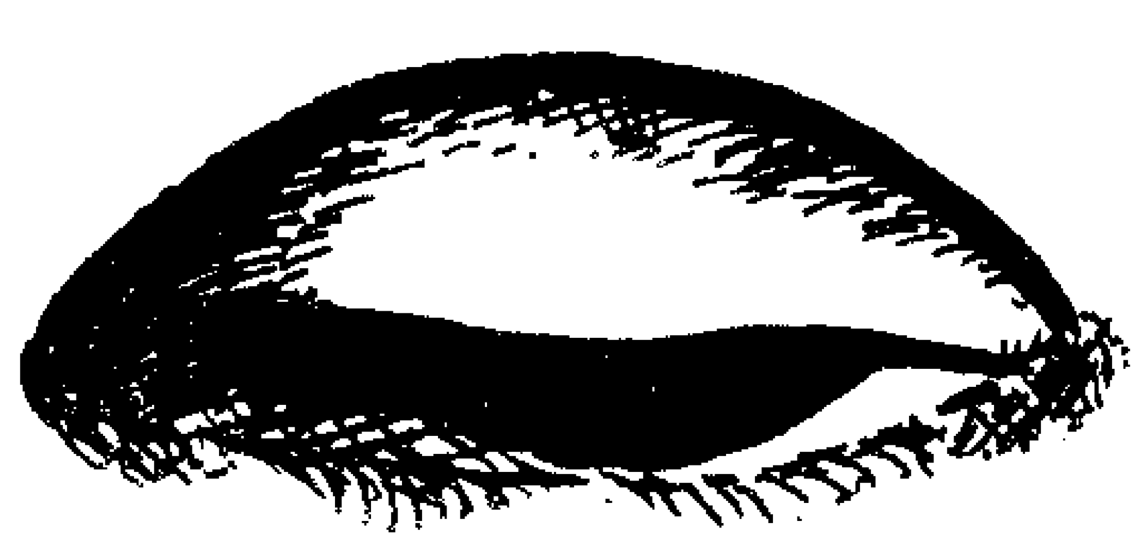

চিত্র ৬১ : তীব্র অশ্রুথলির প্রদাহ

রোগ নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য

১. অশ্রুথলির উপরের চামড়া ফুলে লাল হয়ে যায়
২. অশ্রুথলির উপর চাপ দিলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়
৩. অক্ষিপল্লব অত্যন্ত ফুলে যায়
৪. চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

চিকিৎসা : রোগ সনাক্ত করার সাথে সাথেই উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এন্টিবায়টিক (broad sprectum) মাংসে দিতে হয়। যখন সংক্রমণ সম্পূর্ণভাবে সেরে যাবে তখন অশ্রুথলির অপসারণ অস্ত্রোপচার (dacrocystectomy) করতে হয়। যদি সংক্রমণ না কমে এবং পুঁজেপূর্ণ (Abscess) হয় তবে অস্ত্রোপচার করে পুঁজ বের করে দিতে হয়।

রোগের জটিলতা

১. ল্যাক্রিমাল হাড়ের প্রদাহ (osteomylitis of lacrimal bone)
২. অক্ষিকোটরের কোষের প্রদাহ
৩. মুখমণ্ডলের সেলুলাইটিস
৪. ক্যাভারনাস সাইনাস থ্রমবোসিস।

অপটিক স্নায়ুর প্রদাহ (optic neuritis)

এ অসুখকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, যথা :—

(১) অপটিক স্নায়ুর মাথায় প্রদাহ (papillitis) বা প্যাপিলাইটিস
(২) অপটিক স্নায়ুর অক্ষিগোলকের পিছনের অংশ (retro neuritis bulber)

১. **প্যাপিলাইটিস** (Papillitis)

এতে রোগের সঠিক কারণ জানা যায় নাই, তবে সংক্রামক রোগ যেমন টনসিলের প্রদাহ, সাইনাসের প্রদাহ, জ্বর প্রভৃতিকে কারণ হিসেবে মনে করা হয়।

লক্ষণ : হঠাৎ করে চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, সাধারণত এক চোখ আক্রান্ত হয়। চোখের কোনো ব্যথা থাকে না। চক্ষু পরীক্ষা করলে দেখা যায় আলোর প্রতি চোখের তারার সঙ্কোচনশীলতা কমে আসে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। চোখের অধোদেশ বা ফান্ডাস (fundus) পরীক্ষা করলে অপটিক ডিসে রক্তাধিক্য ও এর কিনারা মুছে যায় এবং পরে অপটিক ডিস ফুলে যায়। এছাড়াও রেটিনার শিরায় রক্ত জমা হয়ে মোটা হয়। রেটিনাতে প্রদীপের আলোক সদৃশ (flame shape haemorrhage) রক্তপাত দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র ৬২)।

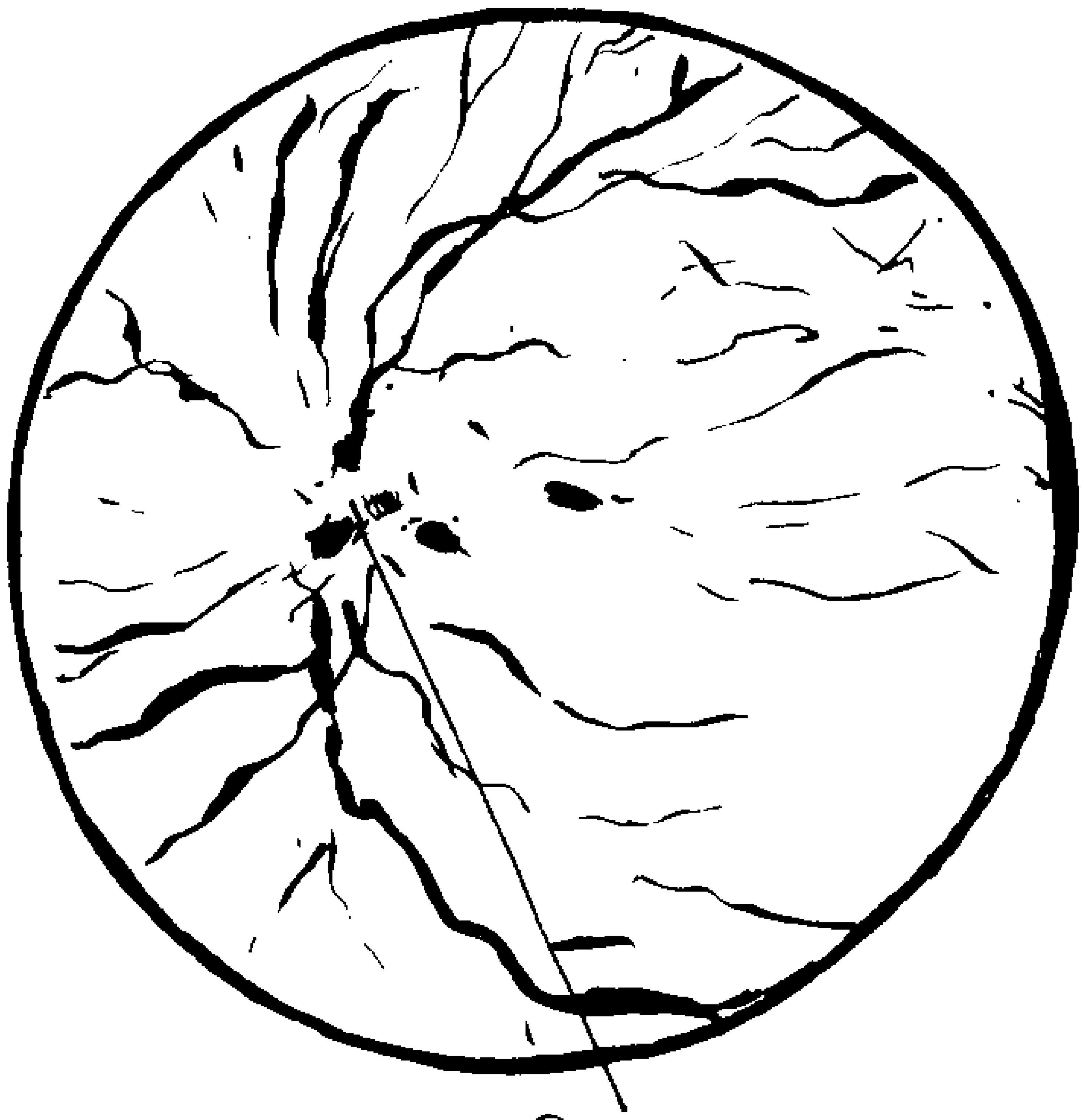

চিত্র ৬২ : প্যাপিলাইটিস

চিকিৎসা

১. কারণ নির্ণয় পূর্বক চিকিৎসাই যথাযথ চিকিৎসা।

২. মাংসে ভিটামিন দেওয়া যায়।

৩. স্টেরয়েড বড়ি খাওয়ানো হয়।

৪. জীবাণু সংক্রমণের চিত্র পাওয়া গেলে এন্টিবায়টিক দেওয়া হয়।

২. **রেট্রোবাল্‌বার নিউরাইটিস** (retrobulbar neuritis)

এ রোগকে একিউট (acute) ও ক্রনিক (chronic) এ দু ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) অকিউট বা হঠাৎ আক্রান্ত রেট্রোবালবার নিউরাইটিস

কারণ

১. সংক্রমণের উৎস হতে অর্থাৎ সংক্রামিত অসুখ হতে
২. বহুমূত্র
৩. ডেসিমিনেটেড স্ক্লেরোসিস (dessiminated sclerosis)
৪. স্থানীয় কোষের প্রদাহ যেমন—অক্ষিকোটরের কোষের প্রদাহ

লক্ষণ

১. হঠাৎ করে দেখতে না পাওয়া।
২. উপরের দিকে তাকালে চোখে ব্যথা অনুভূত করা হয়।
৩. চোখ দেখতে সুস্থ বলে মনে হয় অর্থাৎ জোরালো লক্ষণ ধরা পড়ে না।
৪. ফাণ্ডাস পরীক্ষায় ত্রুটি ধরা পড়ে না।

চিকিৎসা : প্যাপিলাইটিসের মতই

(২) দীর্ঘস্থায়ী রেট্রোবালবার নিউরাইটিস

এ রোগ দু চোখেই হয়। রেটিনার গাগ্লিয়ন কোষ ধ্বংসের ফলে এটি হয়ে থাকে। এ রোগকে বর্তমানে টক্সিক এমব্লাইওপিয়া (toxic amblyopia) বলে।

কারণ

১. তামাক ও তামাকজাতীয় পদার্থ সেবন।
২. ইথাইল অ্যালকোহল
৩. মিথাইল এ্যালকোহল
৪. আর্সেনিক
৫. সীসা (lead)
৬. কুইনিন।

লক্ষণ

১. ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।।
২. রোগী রঙের পার্থক্য করতে পারে না।
৩. কেন্দ্রীয় দৃষ্টিশক্তির পরিমণ্ডলের (central scotoma) খর্বতা প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা

১. তামাক ও তামাকজাতীয় দ্রব্য সেবন বন্ধ করতে হয়।
২. ভিটামিন B_1, B_6, B_{12} ইনজেকশন মাংসে দিতে হয়।

নবম অধ্যায়
টেরা চোখ

টেরা চোখ সম্বন্ধে বর্ণনা করার আগে এ মারাত্মক ব্যাধিকে আমরা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য কিভাবে মেনে নেই এবং এর প্রতি উদাসীন থাকি তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি। টেরা চোখ বালক-বালিকাকে আমরা জনমুখে "লক্ষ্মীটেরা" বলে প্রায়ই শুনে থাকি। অশিক্ষিত জনগণের ধারণা টেরা চোখের বালক বালিকারা লক্ষ্মী হয়ে থাকে। এটিকে তারা কল্যাণ বা মঙ্গল মনে করে থাকেন। কিন্তু এটি যে মারাত্মক দৃষ্টি হরণকারী চোখের রোগ তা তাদের মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র উদয় হয় না। অসুখ যেমন থাকে তেমনি চলতে থাকে এবং যতোই বয়স বাড়ে ততোই মারাত্মক রূপ ধারণ করে। পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও চিকিৎসা দিয়ে তেমন ফল পান না। লক্ষ্মীটেরা তারা কেন বলে থাকেন তার সদুত্তর দিতে পারেন না। লোকমুখে প্রচারিত হয়ে হয়ে এটি বংশপরম্পরায় চলে এসেছে। এ লক্ষ্মীটেরা-কে যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, 'লক্ষ্মীটেরা' বালক-বালিকারা সাধারণত অতি শান্ত হয়ে থাকে বলে তাঁদের পিতামাতা জানান। কিন্তু তারা জানেন না যে, এই শান্ত সুবোধ থাকার কারণ কি? ছেলে বা মেয়েটি শান্ত, ধীরস্থির এতেই তারা খুশি, দুশ্চিন্তামুক্ত। আসল কথা হলো যে লক্ষ্মীটেরা ছেলেমেয়েরা — যে চোখ টেরা থাকে সেই চোখে তারা কিছুই দেখতে পায় না। এক চোখ দিয়ে তারা কোনরকমে কাজ চালিয়ে নেয়। তারা দৃষ্টিশক্তির পরিমণ্ডলের অর্ধেক অংশ শুধু দেখতে পায়। বাকী অর্ধেক দৃষ্টিশক্তির পরিমণ্ডল (visual field) অব্যবহৃত থাকে বা সে এলাকাতে তারা দেখতে পায় না। এ মারাত্মক ব্যাধিতে আমাদের কি করা উচিত তা অতিসংক্ষিপ্ত *আকারে ধারণা দিতে চেষ্টা করছি।*

টেরা : যখন কোনো বস্তুর দিকে তাকাতে গিয়ে একচোখ সোজা থাকে অন্য চোখ বেঁকে যায়। এ বেঁকে যাওয়া চোখকে ট্যারা চোখ বলে।

ট্যারা চোখ নিম্নলিখিত দু'ভাবে ভাগ করা যায় :

১. লুক্কায়িত টেরা চোখ (latent squint)

২. সবসময় টেরা (menifest squint)

(১) লুক্কায়িত টেরা

যখন দু'চোখ খুলে কোন বস্তুর দিকে তাকানো হয় তখন চোখ বাঁকা থাকে না। যখন পরীক্ষক হঠাৎ করে রোগীর একচোখ হাত দিয়ে বন্ধ করে আবার খুলে দেয় তখন দেখা যায় যে, বন্ধ

চোখ যেটা বাঁকা হয়েছিল সেটি আবার সোজা হয়ে গেছে। এটিকেই লুক্কায়িত টেরা চোখ বলে। লুক্কায়িত টেরা চোখ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. ভিতরের দিক (Esophoria)
২. বাইরের দিকে (Exophoria)
৩. উপরের দিকে (Hyperphoria)
৪. নিচের দিকে (Hypophoria)
৫. ঘূর্ণায়মান (Cyclophoria)
৬. বিভিন্ন দিকে তাকালে বাঁকার পার্থক্য দেখা যায় (Anisophoria)।

লুক্কায়িত টেরার কারণসমূহ

(ক) (১) **পূর্বপ্রবণ উপাদান :** অসুস্থ শরীর, কাছের কাজ করার জন্য চোখের অবসন্নতা প্রভৃতি।

(২) **উদ্দীপনাক্ষম উপাদানসমূহ**

২.১ বাচ্চাদের দুচোখের প্রতিবর্ত (Binocular reflex) দুর্বল থাকে সেজন্য তাদের চক্ষু বাইরে বাঁকার প্রবণতা থাকে। (exophoria)

২.২ বালক বয়সে, অভিযোজন ও কাছে দেখার ক্ষমতা (accommodelia & convagence reflex) বেশিই থাকে, ফলে তাদের চোখ ভিতরে বাঁকা হওয়ার প্রবণতা থাকে। (esophoria)

(খ) **প্রতিসরণের ভ্রম** (Error of Refraction)

যাদের দৃষ্টিভ্রম দূরদৃষ্টি (hypermetropia) থাকে তাদের চোখ ভিতরে বাঁকা হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় এবং যাদের দৃষ্টিভ্রম নিকটদৃষ্টি myopia থাকে তাদের চোখ বাইরে বাঁকা হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।

(গ) **শারীরিক গঠনের ক্রটি :** যেমন অক্ষিকোটরের গঠন, মাংসপেশী, বন্ধনী প্রভৃতির ক্রটি।

(ঘ) **কিছু মাংসপেশী ও স্নায়ুর রোগ :** যেমন নিউরোসিফিলিস, ডেসিমিনেটেড স্ক্লেরোসিস ও মায়াসথেনিয়া গ্রেভিস (myesthenia gravis)

চিকিৎসা

১. চশমা দিয়ে।

২. চোখের ব্যায়াম।
৩. অস্ত্রোপচার।

সার্বক্ষণিক টেরা

যখন দুচোখ খুলে কোনো বস্তুর দিকে তাকানোর সময় এক চোখ সোজা আর এক চোখ অন্যদিকে বাঁকা থাকে তাকে সবসময় টেরা বলে। এটি সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) অবশহীন টেরা (non paralytic squint)
(খ) অবশজনিত টেরা (paralytic squint)

ক. **অবশহীন টেরা :** এ টেরায় এক চোখ সোজা এবং অপর চোখ অন্যদিকে বাঁকা থাকে। কিন্তু চোখ ঘোরার সময় সবদিকেই সমানভাবে ঘুরানো যায়।

অবশহীন টেরা কারণসমূহ

(১) প্রতিসরণের ভ্রম (refractive error)
(২) কর্নিয়া, লেন্স ও কাচীয় রসে অস্বচ্ছতা
(৩) রেটিনা ও অপটিক স্নায়ুর রোগ
(৪) কিছু শারীরিক গঠনের ত্রুটি যেমন অক্ষিকোটরের অবস্থিতি ও আকৃতি অস্বাভাবিক মাংসপেশী প্রভৃতি।

অবশহীন টেরাকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়–

(১) ভিতরের দিকে টেরা (convergent squint)
(২) বাইরের দিকে টেরা (divergent squint)
(৩) পরস্পর টেরা চোখ (alternate squint).

ভিতরের দিকে টেরা : যখন এক চোখ সোজা এবং অপর চোখ ভিতরে ঢুকে যায়।

বাইরের দিকে টেরা : যখন এক চোখ সোজা এবং অপর চোখ বাইরের দিকে বাঁকা দেখায়।

পরস্পর চোখ টেরা : যখন কোন সময় ডান চোখ সোজা থাকে তখন বাম চোখ বাইরে বা ভিতরের দিকে বাঁকা থাকে আবার পরক্ষণই বাম চোখ ঠিক থাকে কিন্তু ডান চোখ ভিতরে বা বাইরের দিকে বাঁকা হয়ে যায় তাকে পরস্পর চোখ টেরা বলে।

চিকিৎসা : চশমা দিয়ে (চিত্র ৬১) ক্ষেত্র বিশেষে অস্ত্রোপচার করতে হয়।

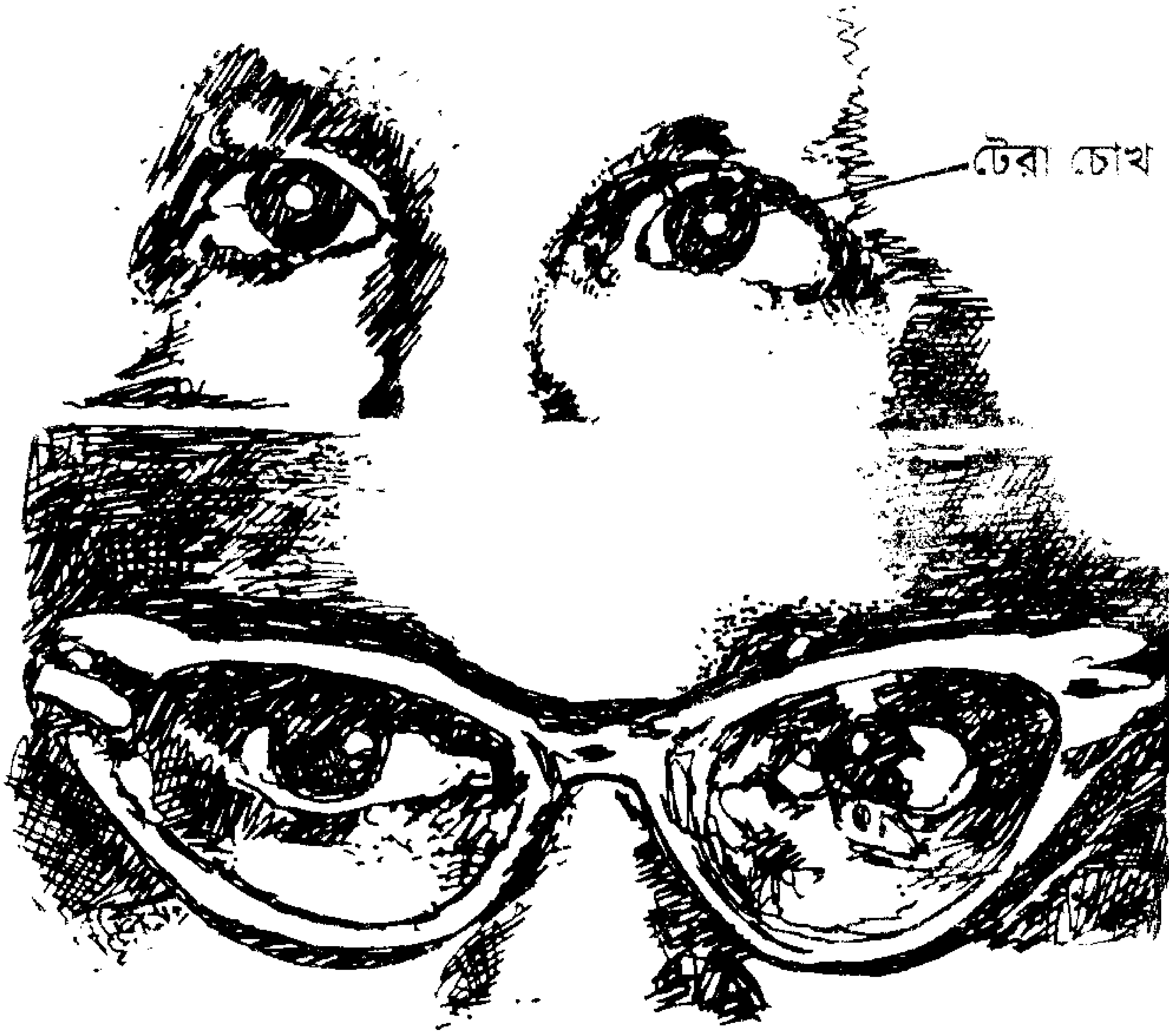

চিত্র ৬৩ : টেরা চোখ ও চশমা দিয়ে চিকিৎসা

(খ) অবশজনিত টেরা : চোখের, মাংসপেশী বা স্নায়ুর বিভিন্ন কারণে অবশ হলে এ টেরা হয়।

লক্ষণ ও চিহ্ন

১. **চোখ ঘুরানোর অসম্পূর্ণতা** (limitation of movement) : যদি কোনো মংসপেশী অবশ থাকে তবে তার কাজের দিকে চোখ টানতে পারে না। ফলে চোখ ঘুরোনো অসম্পূর্ণতা থাকে।

২. একটি বস্তুকে দুটি দেখা (diplopia)–এটি অবশের কারণেই হয়।

৩. মাথায় অবস্থান (head posture) অবশ মাংসপেশীকে সাহায্য করার জন্য মাথাকে tilt করে ও মুখমণ্ডল ঘুরে রাখে।

৪. কান ভোঁ ভোঁ করা ও বমি করা। (vertigo & vomiting)/

একটিকে দুটি দেখার কারণে কান ভোঁ ভোঁ করে, বমি বমি ভাব ও বমি করে।

চিকিৎসা : অস্ত্রোপচারই সফল চিকিৎসা।

লক্ষ্মীটেরাদের জন্য করণীয় : এ রোগের প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা করলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রোগী অন্ধত্বের হাত থেকে রক্ষা পায়। চিকিৎসা গ্রহণ করার জন্য সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কম আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনার হার আরও কম। তাই আমাদেরকে ভূমিকা নিতে হবে জনগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষায় সচেতন করে তুলতে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন ব্যক্তিবর্গের কাজ হবে অশিক্ষিত, অসচেতন ব্যক্তিবর্গের ছেলেমেয়েদের অসুখ হলে তাদেরকে সুপরামর্শ দেওয়া, রোগীর পিতামাতাদের বুঝাতে হবে যে, এ রোগীর আগে থেকে চিকিৎসা করলে রোগ মুক্ত হবে। যেমন জন্মগত ছানির সঠিক সময়ে অস্ত্রোপচার করলে রোগী দৃষ্টি ফিরে পাবে। রোগী গরীব হলে বিত্তবানদের উচিত আর্থিক সহায়তা করা। এভাবে অশিক্ষা অন্ধত্বের সংখ্যা কমে আসবে।

টেরা চোখ সম্বন্ধে জানার বিষয়

১. জন্ম থেকেই যদি টেরা হয় তবে অস্ত্রোপচারে ভাল হয়। (৬ মাস থেকে ১ বৎসর বয়স)

২. দুই থেকে আট বছর বয়সের শিশুদের চশমা দিয়ে, চোখের ব্যায়াম চিকিৎসা (occlusion therapy) দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৩. নয় বছর পর চোখের ব্যায়াম চিকিৎসা কোনো কাজে আসে না। তাই অল্প বয়সেই চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

৪. যদি টেরা চোখের সাথে অস্বাভাবিক নড়াচড়া (nystagmus) থাকে তবে বুঝতে হবে যে, দু'বছর বয়সের আগে বাচ্চার চোখের দৃষ্টির ক্ষতি হয়েছে। এটিতে চিকিৎসা করলে ভাল ফল পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে একটি ২-৪-৬ এর সূত্র আছে। ৬ বৎসর বয়সের পর অস্বাভাবিক নড়াচড়া (nystagmus) হয় না। দুই এবং ছয় বছর বয়সের মাঝামাঝি কারো হয় আর কারো হয় না।

৫. টেরা চোখের চিকিৎসা চশমা, চোখের ব্যায়াম দিয়ে চিকিৎসায় ফল না হলে শেষে অস্ত্রোপচার করে (squint operation) ভাল করা যায়।

দশম অধ্যায়

চোখে ব্যবহৃত ওষুধ : পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ব্যবহার

(ক) জীবাণুঘটিত চোখের প্রদাহ

আমরা সাধারণত জীবাণু প্রতিরোধী ওষুধ (antibiotics) ব্যবহার করে থাকি। চোখে এ ওষুধগুলো ড্রপ, মলম এবং বিশেষ ক্ষেত্রে চোখে ইন্‌জেকশনও দিয়ে থাকি। এগুলো হচ্ছে Penicilliine, Chloramphenichol, Gentamycin, Neomycin, Bacitracin, Polymaxin, Tatracycline, Framycetin প্রভৃতি।

মাত্রা (Dose) **:** চোখে ব্যবহৃত জীবাণু প্রতিরোধী ওষুধসমূহের মাত্রা রোগের আক্রমণের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। সাধারণত ১ ফোঁটা করে দৈনিক ৪–৬ বার দেওয়া হয়। মলম দুপুর ও রাতে শোবার সময় দেওয়া হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা বিরূপ ক্রিয়া : জীবাণু প্রতিরোধী ওষুধের (antibiotics) পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুবই কম। তবুও Neomycin ও Gentamycin. এ চোখ লাল হওয়া, চোখ জ্বালা করা প্রভৃতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিছু কিছু রোগীর দেখা যায়।

ভাইরাস প্রতিরোধী ওষুধ : এগুলো হচ্ছে Acyclovir, 5.I.U.D, Adenine arabinoside প্রভৃতি। এসাইক্লোভির ওষুধ বাজারে জোভিরাক্স নামে মলম পাওয়া যায়।

মাত্রা : দৈনিক ৫ বার ব্যবহার করতে হয়।

ভাইরাস প্রতিরোধী ওষুধের প্রতিক্রিয়া : নেত্রস্বচ্ছে বিন্দুবৎ অস্বচ্ছতা, নেত্রস্বচ্ছে উপরিভাগে পেনাসের (Pannus) আবির্ভাব, গুটিকাময় নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ, অশ্রুসংবহনতন্ত্রে বাধা প্রভৃতি।

(খ) চোখের উচ্চচাপরোধী ওষুধ

এগুলো হচ্ছে Timolol, Adrenalin, Pilocarpine, Acetazolamide প্রভৃতি।

টিমোলল : এটি ০.২৫% এবং ০.০৫% ড্রপ হিসেবে পাওয়া যায়। এটি জলীয় রস উৎপাদন কমিয়ে চোখের চাপ হ্রাস করে।

মাত্রা : দিনে ২ বার দিতে হয়।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া : নেত্রস্বচ্ছের উপরিভাগে বিন্দুবৎ প্রদাহ, নেত্রস্বচ্ছে অসংবেদনশীলতা, নাড়ীর গতি কমায়, শরীরের রক্তচাপ কমে যায় এবং ব্রঙ্কাসে সংকোচন হয়।

এডরিনালিন : এটি ০.৫%, ১%, ২% ড্রপ হিসাবে থাকে। এটি জলীয় রসের বহির্গমন ক্ষমতা বাড়িয়ে চোখের উচ্চচাপ হ্রাস করে।

মাত্রা : দৈনিক ২ বার দিতে হয়।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া : ঝিমঝিমে, মাথাব্যথা, এলারজিক নেত্রবর্ত্ম ও নেত্রপল্লবের প্রদাহ, নেত্রবর্ত্মে রক্তাধিক্য। নাসাশ্রুনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া, ক্ষুদ্র কোণবিশিষ্ট চোখের উচ্চচাপ প্রভৃতি।

পাইলোকারপিন : এটি বাজারে ১%, ২%, ৪% হিসাবে পাওয়া যায়। এটি চোখের তারাকে ছোট করে এবং চোখের কোণ প্রশস্ত করে। চোখের উচ্চচাপ কমায়।

মাত্রা : এটি ১ ফোঁটা করে ৪ বার ব্যবহার করতে হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : চোখে ব্যথা, দৃষ্টিশক্তির অস্বচ্ছতা, ছানি, অক্ষিপট পৃথক হওয়া এবং কণীনিকার সিস্ট প্রভৃতি। এ ছাড়া মাথা ব্যথা, ঘেমে যাওয়া, বমি হওয়া, অবসন্নতা আসা, রক্তচাপ কমে যাওয়া এবং হঠাৎ করে হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া।

এসিটাজোলামাইড বড়ি : এটি চোখের জলীয় রসের উৎপাদন কমিয়ে চোখের উচ্চ চাপ কমায়।

মাত্রা : ২৫০ মিঃ গ্রাম বড়ি ৪ বার খেতে হয়। এর সাথে পটাসিয়াম দিতে হয়।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া : হাত পা ঝিমঝিম করা, শরীরে অবসন্নতা, বমি বমি ভাব, অরুচি, ওজন কমে যাওয়া, পরিপাকতন্ত্রের অসুবিধা যেমন—পেটব্যথা, তরল মল ত্যাগ, বৃক্কে পাথর, রক্তদূষ্ট রোগ (blood dyscrasia) ও স্টিভেন-জনসন সিনড্রোম প্রভৃতি।

(গ) প্রদাহবিরোধী ওষুধ

প্রদাহবিরোধী ওষুধ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ। চোখের রোগের জন্য স্টেরয়েড ব্যবহার বহুল ও ব্যাপক। এগুলো হচ্ছে চোখের পাতার স্পর্শকাতর চর্মপ্রদাহ, অক্ষিপল্লবের কিনারায় প্রদাহ, নেত্রবর্ত্মের দানাদান প্রদাহ, ভারনাল নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ, নেত্রস্বচ্ছ ও নেত্রবর্ত্মের রাসায়নিক পোড়া, কণীনিকা ও সিলিয়ারি বডির প্রদাহ, শ্বেতপটলের প্রদাহ, অপটিক স্নায়ুর প্রদাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। এটি চোখের অসুখসমূহের প্রদাহ কমায় ও নিঃস্রাব বন্ধ করে দেয়। চোখে ব্যবহৃত স্টেরয়েডগুলো হচ্ছে— কসিসোন এসিটেট, *হাইড্রোকর্টিশন এসিটেট, প্রেডনিসোলোন এসিটেট ও ফসফেট, ডেস্কামেথাসন ফসফেট,* বেটামিথাসন প্রভৃতি। স্টেরয়েড ওষুধ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অনেক। প্রধান সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় এমন চোখ সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ক্ষতির বর্ণনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।

চোখে প্রয়োগের ক্ষতিসমূহ	মুখে খাওয়ার ফলে চোখের ক্ষতিসমূহ
১. চোখের চাপ বাড়ায় গ্লুকোমা হয়।	১. ছানির সৃষ্টি
২. ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি	২. চোখের উচ্চচাপ
৩. ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি	৩. অক্ষিপল্লবের শোথ
৪. ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি	৪. নেত্রস্নায়ুর শোথ
৫. নেত্রস্বচ্ছের ঘা ফুটো হয়ে যাওয়া	৫. ক্ষত ধীরে ধীরে শুকায়

স্টেরয়েড মুখে খাওয়ার ফলে শরীরে বিভিন্ন স্থানে ক্ষতি

১. পেটের ঘা
২. মানসিক অবস্থার পরিবর্তন
৩. ফিমার হাড়ের মাথা অদূষিতভাবে সরে যাওয়া
৪. অসটিওপোরোসিস
৫. কুসিং সিনড্রোম
৬. তড়িকাবৎ পদার্থের অসমতা
৭. যক্ষ্মার জীবাণু পূণরায় ক্ষমতা ফিরে পাওয়া
৮. ছানি
৯. ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র বেড়ে যাওয়া।

(ঘ) চোখের পক্ষল পেশীর পক্ষাঘাত (Cycloplegic) ও অক্ষিতারা প্রসারক ওষুধসমূহ

চোখের ইউভিয়ার প্রদাহ, নেত্রস্বচ্ছে ঘা এবং নেত্রস্বচ্ছের অসুখসমূহে, কিছু অস্ত্রোপচারের পরে, চোখের তারা বড় করে চোখ পরীক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে চোখের চশমা নির্ধারণে এর বহুল প্রয়োগ আছে। এগুলোর কয়েকটির শক্তি এবং মাত্রা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

	ওষুধ	শক্তি	ব্যবহারবিধি
১.	এ্যাট্রোপিন—মলম	২ বছরের নিচে বয়সের শিশুদের জন্য ০.৫%	চশমার পাওয়ার নির্ধারণের জন্য ৩ বার করে তিন দিন—পরের দিন পরীক্ষা।
	ড্রপ	২ বছরের উপরের বয়সের জন্য ১%	নেত্রস্বচ্ছের ঘা ও ইউভিয়ার প্রদাহে ১ ফোঁটা ইউভিয়ার দৈনিক তিনবার বা অবস্থাভেদে মাত্রা পরিবর্তন।
২.	হোমাট্রোপিন—ড্রপ	২%, –৫%	এ্যাট্রোপিনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। এটি এ্যাট্রোপিন থেকে দুর্বলতর। এর কার্যক্ষমতা ২৪ ঘন্টা থাকে।

৩. মাইড্রিয়াসিল—ড্রপ ·০৫% –১% চোখের অধোদেশ পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে ভাল—কার্যক্ষমতা থাকে মাত্র ৩–৬ ঘন্টা।

এ্যাট্রোপিনে সংবেদনশীল রোগীর জন্য এ্যাট্রোপিন বিষক্রিয়া (atropine poisoning) দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণসমূহ হচ্ছে মুখ শুকিয়ে যাওয়া, রক্তিমবদনতা, বমি, মাথা ব্যথা, দ্রুতনাড়ীর গতি, চামড়ায় বুদ্বুদ উঠা, রোগী উত্তেজিত হয় এবং প্রলাপ বকতে থাকে। এজন্য সন্দেহজনক রোগীকে না দেওয়া উত্তম। এর বিষক্রিয়া দেখা দিলে সাথে সাথে ওষুধ প্রত্যাহার করা উচিত। খুব খারাপ রোগীদের প্রতিষেধক ওষুধ হিসেবে মরফিল দেওয়া হয়।

এট্রোপিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : শিশুদের ক্ষেত্রে ড্রপ ব্যবহার করলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাদের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, চোখের পাতা ফুলে যায় ও একজিমা দেখা যায় এবং নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ হয়। এসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ওষুধ বন্ধ করা উচিত। এ্যাট্রোপিন মলম ব্যবহার করলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম দেখা দেয়। কারণ ড্রপের তুলনায় মলম রক্তে কম শোষিত হয়। এজন্য শিশুদের ক্ষেত্রে মলম ব্যবহার করা কিছুটা নিরাপদ।

কিছু সংখ্যক ওষুধ ব্যবহারে সতর্কতা

নিম্নলিখিত ওষুধ নেত্রবর্ত্মে প্রদাহ করে

১. সালফোনামাইড
২. কো-ট্রাইমোক্সাজল
৩. পাইরাজিনামাইড
৪. স্ট্রেপাটোমাইসিন (Streptomycin)

ওষুধ : যা ছানি করে (Cataract)

* স্টেরয়েড
* আরগট
* ফেনোথায়াজিন
* ফসফোলিন আয়োডাইড

ওষুধ—যা চোখের উচ্চচাপ করে (Glaucoma)

* স্টেরয়েড
* পক্ষলপেশী পক্ষাঘাত ওষুধসমূহ
* সংকোচনবিরোধী ওষুধ (anti-spasmotic drug)
* অপ্রয়োজনে অত্যধিক পানি খাওয়া
* মনোএমাইনো অক্সিডেজ ইনহিবিটর ও ইমিপ্রামিন

ওষুধ—যা অক্ষিপটে বিষক্রিয়া করে (Retinal toxicity)

* কুইনিন
* ক্লোরোকুইন
* ন্যালিডিস্কছিক এসিড
* লারগাকটিল প্রভৃতি

ওষুধ—যা অপটিক স্নায়ুর শোথ করে (Papilloedema)

* অত্যাধিক পরিমাণে ভিটামিন "এ" সেবন
* জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি
* করটিকোস্টেরয়েড
* টেট্রাসাইক্লিন প্রভৃতি

ওষুধ—যা দৃষ্টিশক্তি শীর্ণ করে (Toxic amblopia)

* যক্ষার ওষুধ
* কুইনিডিন
* মোনোএমাইনো অক্সিডেজ–ইনহিবিটর (MAOI) ও ইমিপ্রামিন
* ব্যথা নিবারক ওষুধ (এন্যালজেসিক) প্রভৃতি।

একাদশ অধ্যায়

চক্ষু রোগে চশমার গুরুত্ব

অতিপ্রাচীন কাল থেকে চক্ষুরোগে চশমা ব্যবহার হয়ে আসছে। চক্ষুরোগে চশমা ব্যবহারের গুরুত্ব বহুল। এটিকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়— একটি রোগ প্রতিরোধক (preventive) এবং অপরটি রোগ নিরাময়ের (curative) জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শস্য কাটা বা মাড়ার মৌসুমে শস্যের পাতা, ডাল বা বীজের আঘাতে কর্নিয়ায় ক্ষত হয়ে অনেক কৃষক-দিনমজুর অন্ধত্বে ভোগে। এ সময়ে যদি চোখে কালো চশমা ব্যবহার করে ক্ষেতে খামারে কাজ করা.যায়, তবে বহু রোগী অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পাবে। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে আমাদের দেশে বেশ কিছু ছোট-বড় কলকারখানা গড়ে উঠেছে। লোহা ও লোহানির্মিত কলকারখানায় চোখের আঘাত বেশ পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে চোখে protective glass ব্যবহার করা উচিত। এতে চোখে আঘাতজনিত অন্ধত্ব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। অনেক রোগীর সূর্যের আলোতে চোখে জ্বালা-পোড়া, চক্ষু লাল হওয়া, অস্বস্তিকর ভাব প্রভৃতি উপসর্গ বর্ণনা করে থাকেন। সেসব রোগীর ক্ষেত্রে photo sun বা photochrometic glass ব্যবহার করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। চোখে পাওয়ারগত (refractive error) সমস্যায় সর্বাধিক চশমা ব্যবহৃত হয়। এটিকে নিরাময় (curative) চিকিৎসা বলা যেতে পারে। অনেক শিশুর Refractive error থাকে। সেগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে চশমা ব্যবহার না করলে চোখের দৃষ্টিশক্তি খর্ব হয়। এ ক্ষেত্রে চশমার ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। Myopia-তে minus lens এবং Hypermetropia-তে plus lens ব্যবহার করা হয় (চিত্র ৬৪, ৬৫)। এজন্য শিশু স্কুলে যাবার আগে চক্ষু পরীক্ষার গুরুত্ব দেওয়া

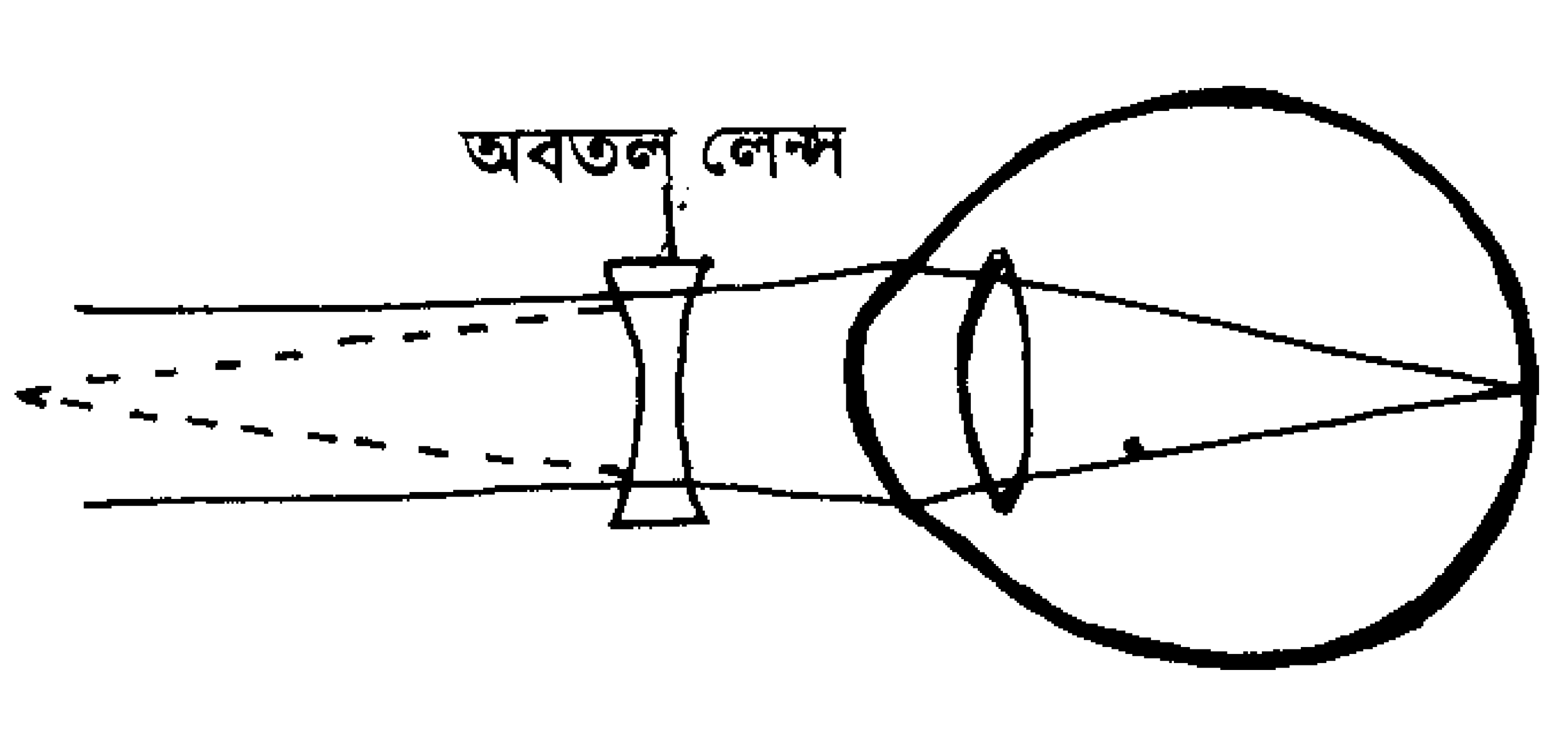

চিত্র ৬৪ : নিকট দৃষ্টিতে অবতল লেন্সের ব্যবহার

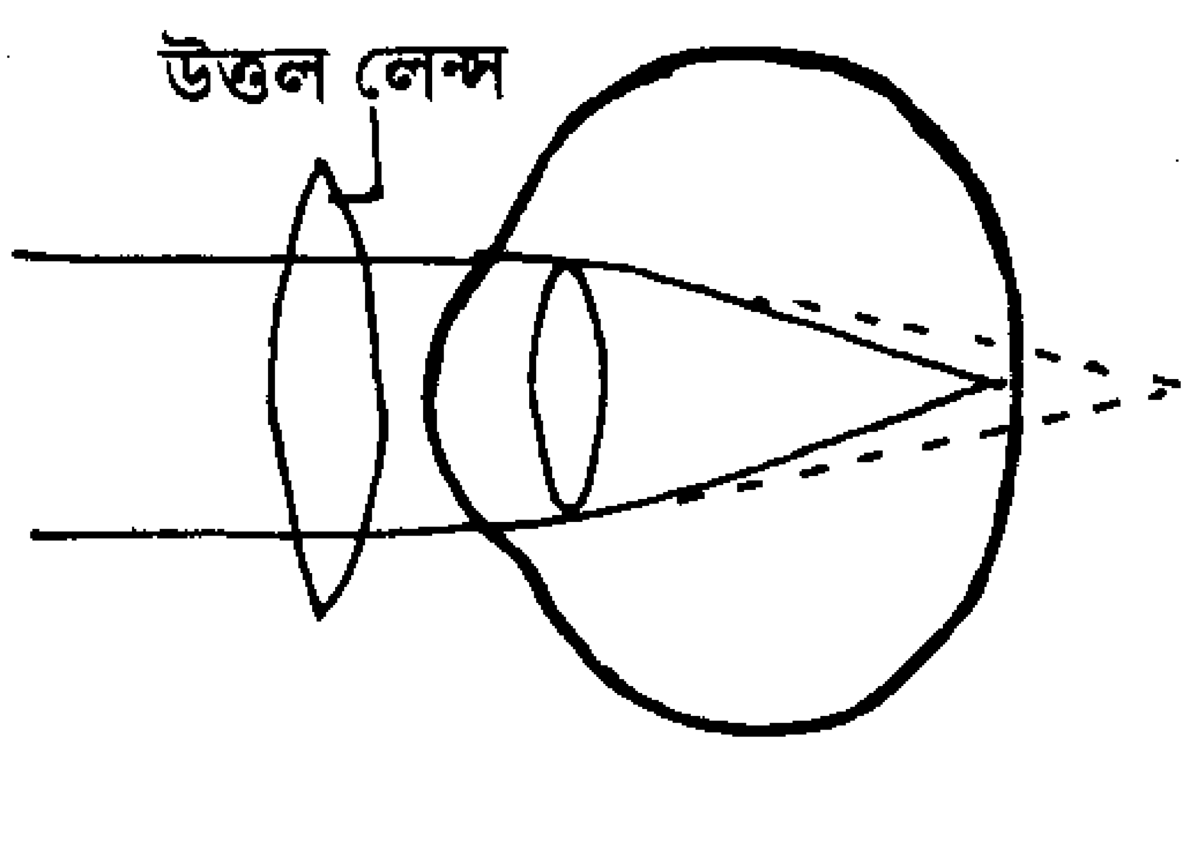

চিত্র ৬৫ : দূরদৃষ্টি ক্রুটিতে উত্তল লেন্সের ব্যবহার

হয়েছে। সকল বয়সেই refractive error-এর জন্য চশমার প্রয়োজন। বিশেষ করে ৪০ বৎসর বয়সের পর নিকট কাজের সুবিধার জন্য চশমা নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ

bifocal চশমা দিয়ে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সেও বিভিন্ন কারণে চশমা ববহার করলে উপকার পাওয়া যায়। কর্নিয়ার ক্ষতে কালো চশমা পড়তে উপদেশ দেওয়া হয় যাতে চোখে আলোভীতি কমে যায়। চক্ষুরোগে চশমার বহুল ব্যবহার আছে। সময়মত চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে চোখের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

রোদ-চশমা বা সানগ্লাসের গুরুত্ব

রোদের মধ্যে বা প্রখর সূর্যের কিরণের সময় চলাফেরা করার জন্য সানগ্লাস খুবই আরামদায়ক। জলাশয়, নদী, সাগর, সৈকত প্রভৃতিতে ভ্রমণের সময় নদীর পানি থেকে প্রতিফলিত সূর্যকিরণ বা চিক্‌চিক বালি থেকে প্রতিফলিত সূর্যকিরণ চোখে পড়লে অস্বস্তিকর ভাব সৃষ্টি হয়। সানগ্লাস পড়লে এ অস্বস্তিকর ভাব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বিশেষ করে চোখের বিভিন্ন রোগ যেমন নেত্রবর্ত্মের প্রদাহ, নেত্রস্বচ্ছে বা কর্নিয়ায় ক্ষত, ছানি অপারেশনের পরেও চোখের আলোভীতি কমানোর জন্য সানগ্লাস ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

সানগ্লাসের সাহায্যে শতকরা প্রায় ৮৫% দৃশ্যমান আলো (visible light)-কে ফিল্টার করা হয়। যার ফলে অতিরিক্ত আলো চোখে প্রবেশ করতে পারে না। সেজন্য প্রখর রোদেও চোখে আরাম অনুভূত হয়। সানগ্লাস বিভিন্ন রঙের হতে পারে। যেমন বাদামি, ধূসর, গোলাপি, সবুজ, গাঢ় নীল ইত্যাদি। ব্যক্তিগত পছন্দের উপরই সাধারণত বিভিন্ন রঙের সানগ্লাস নির্বাচন করা হয়। স্বচ্ছ কাচের ওপর এসব রঙের ধোঁয়ার সাহায্যে কাঁচ রঙ করা হয় এবং সানগ্লাস তৈরি করা হয়। উন্নতমানের সানগ্লাস সব সময়ই গ্রাইন্ড ও পালিশ করা হয়। যার ফলে গ্লাসের ভেতর দিয়ে কোনো বস্তু বা রাস্তা আঁকাবাঁকা মনে হয় না।

আমাদের দেশে ফুটপাতে বা অনেক জায়গায় কম দামী সানগ্লাস পাওয়া যায়। নিম্নমানের রঙিন প্লাস্টিক শিট থেকে গোল করে কেটে এসব গ্লাস তৈরি করা হয়। এসব গ্লাস প্রয়োজনীয় গ্রাইন্ডিং ও পালিশ করা হয় না বলে রাস্তাকে বা দৃশ্যমান বস্তুকে আঁকা-বাঁকা মনে হতে পারে (objective distortion)। এসব সানগ্লাস অনেকক্ষণ ব্যবহার করলে মাথা ব্যথা হতে পারে।

ফটোক্রমিক গ্লাসের উপকারিতা

এ গ্লাস রোদে এর রঙ পরিবর্তিত হয়ে গাঢ় হয়ে যায়—যা কিছুটা সানগ্লাসের কাজ করে। রোদে এই গ্লাস সানগ্লাসের মতো কাজ করলেও তা সানগ্লাসের মতো অতিশক্তিশালী ফিল্টার নয়। সানগ্লাসে ৮৫% দৃশ্যমান আলো ফিল্টার হয় আর ফটোক্রমিক গ্লাসে মাত্র ১৫% আলো ফিল্টার হয়। তবুও রোদে ফটোক্রমিক গ্লাস বেশ আরামদায়ক। কিন্তু সানগ্লাসের বিকল্প নয়। ফটোক্রমিক গ্লাসের সুবিধা এই—এতে প্রয়োজনীয় পাওয়ার ব্যবহার করে সময় মতো যেমন দিবাভাগে গ্লাস রঙিন হয়ে যায় এবং রাতে আবার সাদা হয়ে যায়, ফলে পাউয়ারগত দেখার কোনো সমস্যা তেমন হয় না। যাদের প্রয়োজনীয় পাওয়ার নিতে হয় আবার

আলোভীতি আছে তাদের এ গ্লাস খুবই উপযোগী। তরুণ-তরুণীদের বেশি পছন্দ এই ফটোক্রমিক গ্লাস।

ফটোক্রমিক গ্লাসে সিলভার হ্যালাইড মাইক্রোক্রিস্টাল থাকে যা রোদে বিভাজিত হয়ে সিলভার ও হ্যালোজেনে রূপান্তরিত হলে কাচের রঙের পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্লাসটি রোদ থেকে ছায়ায় আনলে আবার সিলভার হ্যালাইড হয়ে যায় এবং কাঁচ সাদা হয়ে যায়। বাণিজ্যিকভাবে এসব গ্লাসকে ফটো গ্রে, ফটো ব্রাউন বা অতি ধূসর ইত্যাদি বলা হয়।

আমেরিকার কর্নিং গ্লাস কোম্পানি এক ধরনের ফটোক্রমিক লেন্স তৈরি করেছে যা রোদে গেলে পূর্ণ সানগ্লাসের মতো হয়ে যায়। কিন্তু ছায়াতে সামান্য রঙিন মনে হয়। বাণিজ্যিকভাবে এসব গ্লাসকে ফটোসান গ্রে, ফটোসান ব্রাউন ইত্যাদি নামকরণ করা হয়ে থাকে।

চোখের নিরাপদ চশমা বা কাঁচ

যেসব চশমার কাচ ভেঙে গেলে ভোতা ধারহীন বড় বড় টুকরা হয় তাকেই নিরাপদ কাঁচ (safety lens) বলা হয়। এই কাঁচ ভেঙে গেলে দূরে ছিটকে পড়ে না (চিত্র ৬৬)।

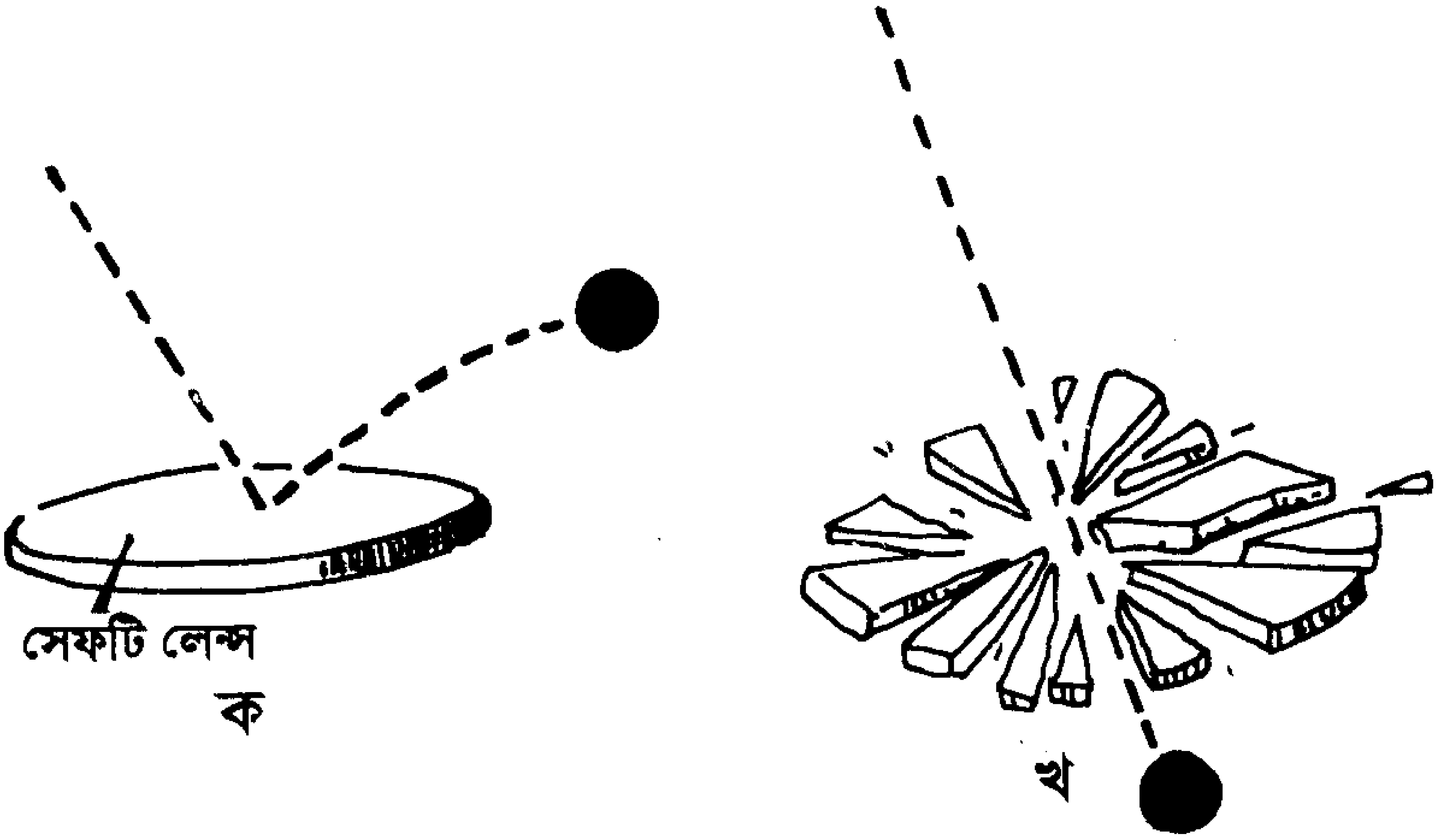

চিত্র ৬৬ : সেফটি লেন্স

(ক) লোহার বল উপর থেকে ফেললেও যা টুকরা হয় না।
(খ) সাধারণ কাঁচ ভেঙে টুকরা হয়ে যায়।

সুতরাং দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনেক কম। সাধারণ চশমার কাঁচ ভেঙে গেলে ছোট ছোট টুকরা হয় এবং টুকরাগুলো ধারালো হয়— তা চোখের ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। শিশুদের,

খেলোয়াড়দের ও কল–কারখানার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কাঁচ ভেঙে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। সে কারণে শিশুদের, খেলোয়াড়দের ও কলকারখানার শ্রমিকদের বেশ উপযোগী এ নিরাপদ কাঁচ। নিরাপদ কাঁচ প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নিরাপদ কাচ কয়েক প্রকার পাওয়া যায়। যেমন--

(১) **প্লাস্টিক লেন্স** (Plastic hard resin lens) : আধুনিক শক্ত রেসিনের তৈরি প্লাস্টিক লেন্স একটি নিরাপদ লেন্স।

(২) **তাপ প্রদত্ত শক্ত কাচের লেন্স** (Heat treated hardened glass lens) : বিশেষভাবে তৈরি এই লেন্স কম পক্ষে ২–৩ মি. মি. পুরু হয়। শিশুদের ও খেলোয়াড়দের জন্য বিশেষ উপযোগী।

(৩) **ল্যামিনেটেড লেন্স** (Laminated lens) : কাঁচ ও প্লাস্টিকের মিশ্রণে তৈরি হয়।

(৪) **ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্ট লেন্স** (Impact resistant lens) : কাচের লেন্স তৈরি করার পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্যপটাশিয়াম দ্রবণে ১৮ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখলে তা দিয়ে নিরাপদ লেন্স তৈরি হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

১. চিকিৎসাবিজ্ঞান পরিভাষা কমিটি। **চিকিৎসাবিজ্ঞান পরিভাষা**। বাংলা একাডেমী। তৃতীয় সংস্করণ। জুন, ১৯৯০।

২. মোহাম্মদ ইউনুস। *খাদ্যবিজ্ঞান*। জুন ১৯৮৭। ৮৯–১০০ পৃষ্ঠা।

৩. ডাঃ এম.এ. মতিন ও ডা. মো : মিজানুর রহমান। **চক্ষু চিকিৎসা**। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫। পৃষ্ঠা ৮৫–৯২।

৪. আই. পি. এইচ. এন/ ইউনিসেফ/ এইচ. কে. আই. বাংলাদেশ। *অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধ—প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা*, জুন, ১৯৮৭। পৃষ্ঠা – ৭।

৫. এইচ. কে. আই. এবং আই. পি. এইচ. এন.। *Bangladesh Nutritional Blindness Study.* 1982 - 83. Page - 10.

৬. W.H.O Regional office for South-East Asia, New Delhi. September 1978.

৭. Kabir M. H. *Primary Eye care.* Trans—oph. Society, Bangladesh (1989), vol 16, No. 2, 17 - 21 এবং "প্রাথমিক চক্ষু চিকিৎসা, মার্চ ১৯৯৫।

৮. Ali S. M. *Management of Mobile Ege care Service.* Transophthalmic Society, Bangladesh (1985) Vol. XIII part I-40-42.

৯. Islam M. A. *Primary Eye Care of Communicable disease.* Transophthal Soc. Bang (1985) vol XIII part--I--50--55.

১০. Jalil M. A. *Nutrition and Eye care.* Trans oph. Soc. Bang. (1985) vol XIII. Part 66-76.

১১. মুক্তাদির এ. কে. এম. এ এবং আহম্মেদ জে. এন। *আঘাতজনিত চক্ষুরোগের প্রাথমিক চিকিৎসা।* Trans-oph-Soc-Bang (1988) vol-15 No-11-33-30.

১২. Sharif, M. A. *Corneal ulcer in Bangladesh" Etidogical diagnosis's.* Trans-ophthal. Soc. Bang. 17, 12-21-90.

১৩. Wahed. M. A. *Paddy leaf & grain injury of the Eye.* Trans. oph. Soc. Bang (1990) Vol. No. 17 . P. 37-41.

১৪. Crick R. P. *Aspects of the epidemiology of ch. Simple glaucoma.* Tran—oph. Soc. Bang-vol-19 no. [1990. 18-28.]

পরিভাষা

অক্ষিগোলক	Eye ball
অক্ষিকোটর	Orbit
অক্ষিপত্র প্রদাহ	Blepharitis
অক্ষিপল্লব	Eye lid
অচ্ছোদপটল/ নেত্রস্বচ্ছ বা কর্নিয়া	Cornea
অধোদেশ	Fundus
অন্তর্ভেদী ও ভেদক আঘাত	Penetrating or Perforating injury
অপরিপক্ব স্তব	Immature stage
অমরা	Placenta
অশ্রু	Tear
অক্ষিকৃষ্ণ	Choroid
অশ্রুগ্রন্থি	Lacrimal gland
অশ্রুথলি	Lacrimal sac
অক্ষিতারা	Pupil
অক্ষিস্নায়ু	Optic nerve
অপটিক স্নায়ুর চক্রফলক	Optic disc
অন্তরঝিল্লি	Endothelium
অমসৃণ	Raw
আপজাত্য	Degeneration
উপরিতল	Surface
উপঝিল্লী	Epithelium
কণীনিকা/আইরিশ	Iris
কাচীয় রস	Vitreous humour
কৃত্রিম নেত্রস্বচ্ছ	Pseudo cornea
ক্রমবৃদ্ধি স্তর	Progressive stage
ক্ষতসজ্জা	Dressing
ক্ষত তন্তুর স্তর	Cicatrization
ক্ষতাঙ্কুর কলা	Granulation tissue
ক্ষার	Alkali
খিলান	Fornix
গঠন	Structure
চোখের উচ্চচাপ	Glaucoma
জলীয় রস	Acqueous humour
ঝিল্লি	Membrane
ঝিল্লিশ্রুতি	Dialysis
নেত্রবিন্দু	Punctum
তন্তুময়	Fibrous
নেত্রনালীর নালিকা	Canaliculus
নেত্রস্বচ্ছস্ফীতি	Staphyloma
নেত্রসিত	Leucoma.
নিদর্শন	Sign
নিঃস্রাব	Exudate
নাসাশ্রুনালী	Naso lacrimal duct
পরকলা	Lens
পূর্বপ্রবণ উপাদান	Predisposing factors
পরিণতি	Sequlae
পুষ্টি	Nutrition
পীতকেন্দ্র	Macula
ব্যাপন	Diffusion
বিপাক	Meabolism
ভ্রংশ	Prolapse
মধ্যত্বক	Mesoderm
রোগতত্ত্ব	Pathology
রোগজন্মতত্ত্ব	Pathogenesis
রঞ্জন	Stain
রক্তপুঞ্জিভবন	Congestion
রঞ্জকস্তর	Pigmented layer

লক্ষণ	Symptoms
স্থানচ্যুতি	Dislocation
সংবহনতন্ত্র	Vascular Systems
চালক স্নায়ু	Motor nerve
সংজ্ঞাবহ স্নায়ু	Sensory nerve
সমবেদী স্নায়ু	Sympathetic nerve
শ্বেতপটল	Sclera
থেতলানো আঘাত	Contusion injury
প্রতিপ্রভা	Fluorescein
জীবাণুমুক্ত	Sterile
স্নায়ুআকর্ষী ক্ষত	Neurotrophic ulcer
শালদুধ	Clostroum
হাম	Measles
পূর্বগ	Precursor
রাতকানা	Night blindness
দৈহিক বৃদ্ধি	Growth
তাৎক্ষণিক	Emergency
বন্ধনী	Ligament
দূরদৃষ্টি রোগ	Hypermetropia
নিকট দৃষ্টিরোগ	Myopia
উপদংশার্বুদ	Gumma
প্রাথমিক কেন্দ্র	Primary center
দৃষ্টিশক্তি পরিধি	Visual field
গুটিকা	Follicle
দানা	Granule
পিড়কা	Papillae
প্রারম্ভিক	Incipient stage
জটিলতার স্তর	Stage of complication
তড়িৎ বিশ্লেষণ	Electrolysis
নেত্রবর্ত্মে মাংসবৃদ্ধি	Pterigium
শুষ্কচোখ	Xerophthalmia
জন্মগত ছানি	Congenital cataract
টেরা চোখ	Squint
স্ফীতস্তর	Intumescent stage
নেত্রস্বচ্ছের অধঃক্ষেপ	Keratic pricipitate K.P.

Dhaka
BANSDOC Library
Accession No. 17754
Date 10.6.04 Sign.